অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ১৯ | দিন : ০৪ | মেয়াদকাল : ৬০ মিনিট

শিরোনাম : **ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ নষ্টের কারণ, ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসস্থল এবং আবাসস্থল, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিভিন্ন উপায়**

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশে ইলিশ মাছের আবাসস্থল ধ্বংসের কারণ এবং আবাসস্থল ও পরিবেশ উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা উল্লেখিত বিষয় উত্তরণে অবদান রাখতে পারে।

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- ইলিশ মাছের পরিবেশ ও আবাসস্থল নষ্টের কারণ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে ইলিশ মাছের ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসস্থল সম্পর্কে পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করতে পারবেন;
- পরিবেশ ও আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচী	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা	স্বাগতম পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন; বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ও উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু	- আবাসস্থল ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা; - বাংলাদেশে ইলিশ মাছের ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসস্থল ও পরিবেশের ওপর আলোচনা; **আবাসস্থল ধ্বংসের কারণ-** - পানি প্রবাহ (নাব্যতা) ও নদীর গতিপথ পরিবর্তন; - পলি জমা, নতুন চর, অভিপ্রয়াণ পথ বন্ধ হওয়া; - জলজ পরিবেশ দূষণ; - ভূমি পুনরুদ্ধার; - নদীর আড়াআড়ি বাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাধ নির্মাণ - আবাসস্থল ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায়	আলোচনা প্রশ্ন-বিরতি-নাম ও ফ্লিপচার্ট ফ্লিপচার্ট/ ট্রান্সপারেন্সি	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	- মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা; - উদ্দেশ্য যাচাই এবং - পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান।	প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, ডাস্টার, হ্যান্ডআউট।			

ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ নষ্টের কারণ, আবাসস্থল ও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপায়

ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ?

পূর্বে বাংলাদেশে প্রায় সকল প্রধান নদ-নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। প্রধান নদ-নদী ছাড়াও কর্ণফুলী, ফেনী, মুহুরী এবং পদ্মা (গঙ্গা) ও ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রায় সকল শাখা-প্রশাখা নদীতেও ইলিশের প্রাচুর্য ছিল (আহ্সানউল্লাহ্,১৯৬৪; কোরেশী, ১৯৬৮; হালদার, ১৯৯২)। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের শাখাগুলোর মধ্যে গড়াই, কুমার, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, নবগঙ্গা, ধলেশ্বরী, কালিগঙ্গা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছিল। রাজা (১৯৮৫) এর মতে ইলিশের অভিপ্রয়াণ ব্রহ্মপুত্র নদের আসাম রাজ্যের তেজপুর পর্যন্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে নানাবিধ কারণ যেমন– কম পানি প্রবাহ, পলি ভরাট, দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রকার বাঁধ নির্মাণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রায় দেশের বিভিন্ন এলাকার ১৫০০ কিলোমিটার নদীপথে ইলিশের আবাসস্থল নষ্ট হয়ে গিয়েছে (হালদার, ২০০১)। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ইলিশ মাছের উৎপাদন প্রায় ১৯% কমে গিয়েছে। ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখাসহ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইলিশ মাছের আবাসস্থল

ইলিম মাছের ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপজ্জনক আবাসস্থল চিত্র ১৮.১ এ দেখানো হলো।

ইলিশের আবাসস্থল নষ্ট ও অবক্ষয়ের কারণ

ইলিশ মাছের আবাসস্থল নষ্ট ও অবক্ষয়ের বহুবিধ কারণের মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন বাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ, ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পলি ভরাট এবং পানি দূষণ অন্যতম। এ কারণগুলোর সুনির্দিষ্ট প্রভাব ও ক্ষেত্র সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ , বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ, নদীর আড়াআড়ি বাঁধ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে দেশে প্রায় ৩.৩৬ মিলিয়ন হেক্টর প্লাবন ভূমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন বাঁধ, ৭,০২৪ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ, ৩,০১৭ কিলোমিটার নিষ্কাশন খাল, ৬,৮৮৪টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার, ৩,৮৮৮টি ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ এবং ১,০৬৪টি নদী বাঁধের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে (এমপিও, ১৯৯০)। এ সকল নির্মাণ এবং নদীতে আড়াআড়ি বাঁধের ফলে বহুসংখ্যক ইলিশের আবাসস্থল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের ফলে সমুদ্র থেকে বলেশ্বর-নবগঙ্গা ও কালিগঙ্গা হয়ে কুমার ও পদ্মা নদীতে ইলিশের অভিপ্রয়াণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। (মাহমুদ ইট, এল, ১৯৯৪)। ফলে উক্ত নদীসমূহে এখন আর ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না। মুহুরী সেচ প্রকল্প ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় ফেনী নদীর মুখে আঁড়াআড়ি বাঁধ দেয়ার ফলে বাণিজ্যিকভাবে আহরিত প্রতি বছর প্রায় ৫০০ টন ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ হয়ে গিয়েছে (হালদার, ১৯৯২)। চাঁদপুর, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, মেঘনা-ধনাগোদা সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, মধুমতি-নবগঙ্গা প্রকল্প ইত্যাদি একই রকমভাবে ইলিশ সম্পদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কারণ এসব প্রকল্প এলাকাগুলো ইলিশের (জাটকা) নার্সারি ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ

ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে পদ্মা নদীর পানির প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে এবং আপার পদ্মা ও এর প্রায় সকল শাখা নদী অগভীর হয়ে গিয়েছে, এমনকি কোন কোন নদী প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। এর ফলে পদ্ম নদীর উপরিভাগে ইলিশের পরিমাণ কমে গিয়েছে, কোন কোন স্থান প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইলিশ শূন্য হয়ে গিয়েছে। পদ্মানদীর পানি প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪ এর মধ্যে মোট ধৃত ইলিশের পরিমাণ প্রায় ২৫.৮% কমে গিয়েছিল (হালদার এবং রহমান, ১৯৯৮)।

মেঘনা নদীর মোহনায় ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম

হাতিয়া, ভোলা এবং মেঘনা মোহনায় অর্ধনিমজ্জিত দ্বীপগুলোর ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের একটি বৃহৎ পরিকল্পনা রয়েছে। এ অঞ্চলে ইলিশের গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন ক্ষেত্র। উক্ত বাঁধ নির্মাণ করা হলে ধারণা করা যাচ্ছে যে, ইলিশের প্রজনন, অভিপ্রয়াণ এবং চারণক্ষেত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। উক্ত বাঁধের প্রভাবে ইলিশ মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা ইতোমধ্যেই পদ্মা, ফেনী, নবগঙ্গা এবং কুমার নদীতে ঘটেছে।

পলি ভরাট (Siltation)

নদ-নদীতে পলি ভরাট অন্যান্য মৎস্য সম্পদের ন্যায় ইলিশের জন্যও মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। প্রতিবছর প্রায় ২,১৯৭ মিলিয়ন টন পলি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীসমূহের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে নিষ্কাশিত হয় (Curray এবং Moor ১৯৭১)। একইভাবে মেঘনা নদীসমূহের মাধ্যমেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পলি বঙ্গোপসাগরে জমা হচ্ছে।

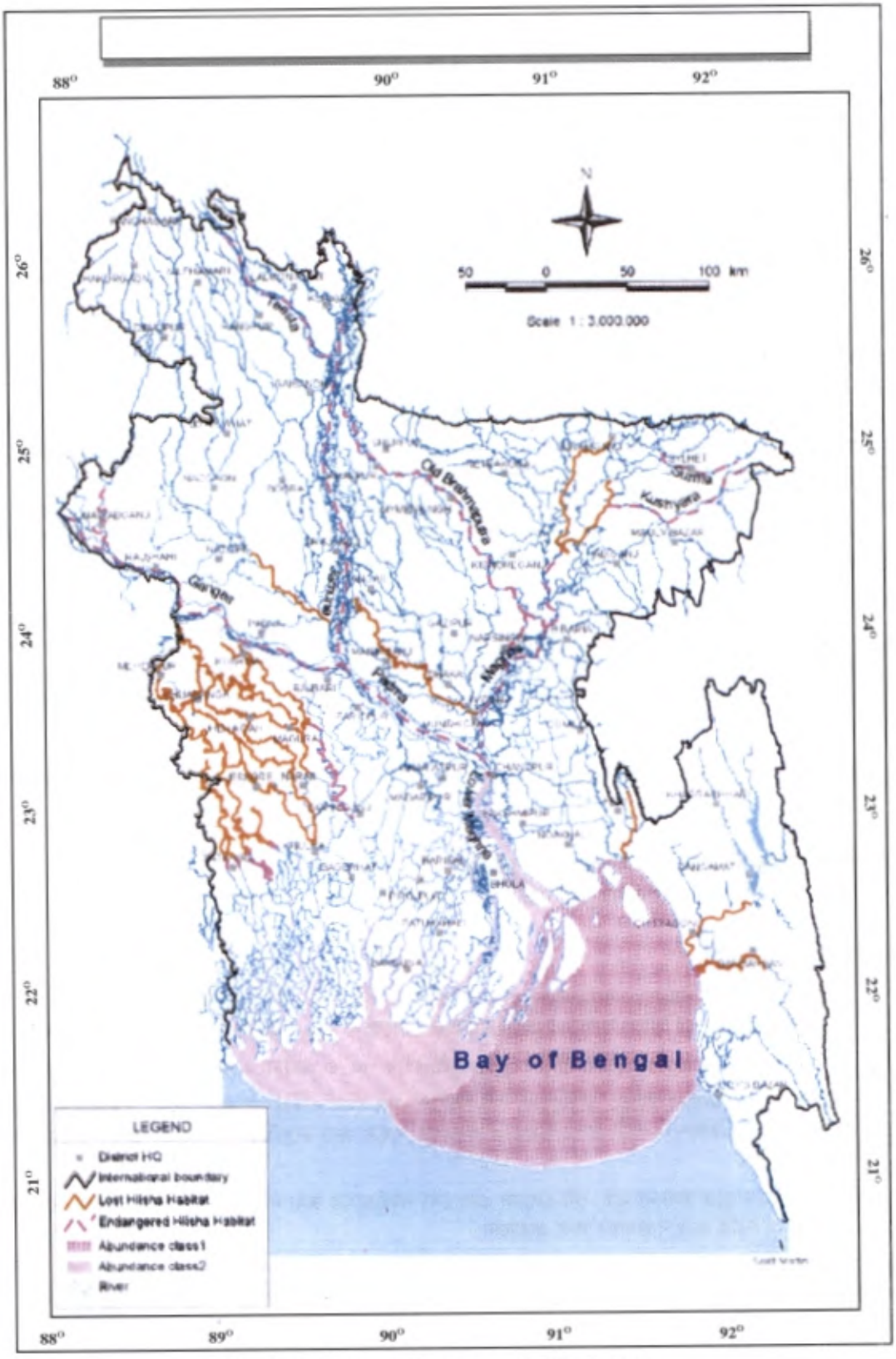

চিত্র-১৮.১৪ ইলিশের প্রাপ্তি স্থান ও ধ্বংশ প্রাপ্ত আবাসস্থল।

হাতিয়া, সন্দ্বীপ, ভোলা, নোয়াখালী অঞ্চলের প্রধান নদীগুলোর ব্যাপক পাড় ভাঙ্গার ফলে উক্ত অঞ্চলে ক্রমাগত ভাবে নদীর হাইড্রোলজি, তলদেশের টপোগ্রাফী পরিবর্তন হচ্ছে এবং অনেক চর ও ডুবোচরের সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া ইলিশের আবাসস্থল নষ্ট করছে ও ইলিশের অভিপ্রয়াণ পথ বন্ধ এবং পরিবেশের পরিবর্তন করছে। যার ফলে ইলিশ আহরণে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, বিগত ১৯৯৯-২০০১ সালে বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ দেশের নিম্নাঞ্চলে চর ও ডুবোচর সৃষ্টির মাধ্যমে ইলিশের অভিপ্রয়াণ পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া।

জলজ পরিবেশ দূষণ

সকল প্রকার বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলা বাংলাদেশে প্রায় প্রথার পর্যায়ে পড়ে। তা ছাড়া শিল্প-কারখানা বৃদ্ধি, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি, নগর ও পৌর এলাকার ময়লা আবর্জনা প্রতিনিয়ত নদীসমূহকে দূষিত করছে। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী, ঢাকার বুড়িগঙ্গা, নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা, সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীতে মাছের ব্যাপক মৃত্যুর প্রধান কারণ এসব নদীর পানি দূষণ।

বিভিন্ন প্রকার দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থের মধ্যে কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, গৃহস্থালি ও পৌর এলাকার বর্জ্য এবং বিভিন্ন কৃষি রাসায়নিক পদার্থই প্রধান। প্রতি বছর কৃষি জমি হতে প্রায় ২,৭৫০ মেঃ টন কীটনাশক (মোট ব্যবহারের ২৫%) ধৌত হয়ে জলাশয়ে পতিত হচ্ছে এবং নদীর পানি দূষিত করছে। এ দূষণ প্রক্রিয়া শুধু আমাদের দেশের নদীসমূহের পরিবেশ পরিবেশ দূষিত করছে না, সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় পরিবেশকেও দূষিত করছে। (ESCAP ১৯৮৮। ESCAP এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের ১৪৪টি শিল্প-কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য সরাসরি কর্ণফুলী নদী এবং বঙ্গোপসাগরে ফেলা হয়। খুলনা শহরের প্রায় সকল শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য একইভাবে রূপসা নদী এবং উপকূলীয় অঞ্চলকে দূষিত করছে।
আমাদের দেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদী ও তার শাখা-প্রশাখা ভারত, নেপাল ও ভুটান হয়ে আমাদের জলসীমায় পদার্থ বয়ে নিয়ে আসছে। ফলে বাংলাদেশের জলজ পরিবেশ দূষণ অদূর ভবিষ্যতে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এ বিষয়ে এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ গ্রহণ করা না হলে ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য মাছসহ ইলিশ সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে তুরাগ-টঙ্গী, বুড়িগঙ্গা, শীলতক্ষ্যা, কর্ণফুলী, আপার মেঘনা ও তার শাখা-প্রশাখার জলজ পরিবেশের দূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। উপরোক্ত নদ-নদীর পানি দূষণ ভবিষ্যতে নিম্নে অঞ্চলের নদ-নদীসমূহকেও আক্রান্ত করবে এবং ইলিশ মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মাছের এবং অন্যান্য জলজ সম্পদের ওপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ, নদী শাসন, ফারাক্কা বাঁধ, পলি ভরাট, পানি দূষণ এ সমস্ত বিষয়ের প্রভাব এখনও বাংলাদেশে নির্ণয় করা হয়নি। কাজেই, এ সমস্ত বিষয়ের প্রভাব নির্ণয় করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের ওপর ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের ওপর এর প্রভাব নিরূপণ করে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

ইলিশ মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উপায়সমূহ

ইলিশ মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত উপায়সমূহ বিবেচনা করা আবশ্যক।

বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে করণীয়

- নতুন কোন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ এবং নদীতে আঁড়াআঁড়ি বাঁধ নির্মাণ, ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে ইলিশ সম্পদের ওপর এর প্রভাব বিবেচনা করে যথাযথ সংরক্ষণের উপায় গ্রহণ করা আবশ্যক।
- উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের সময় ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ পথ ও অন্যান্য মাছের চলাচলের পথ মুক্ত রাখা উচিত।
- ইলিশ মাছ ও অন্যান্য মাছের অভিপ্রয়াণ, নৌ-চলাচল এবং সেচ কার্যক্রমের জন্য তিস্তা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, মধুমতি, গড়াই নদীর পরিবেশ ও পানি প্রবাহ উন্নত ও অব্যাহত রাখার জন্য উল্লেখিত নদীসমূহের তলদেশ খনন করে সংস্কার করা প্রয়োজন।
- ইলিশ মাছ ছাড়াও অন্যান্য মাছ, নৌ-চলাচল এবং সেচ কার্যক্রমের জন্য নদী শাসন ও পানি ব্যবহার সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
- মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ইলিশ মাছের আবাসস্থল সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, নদী শাসন ও পানি সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ নৌচলাচল কর্তৃপক্ষ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর এর সঙ্গে একত্রে কাজ করা প্রয়োজন।
- মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়কে উল্লেখিত ক্ষতিগ্রস্ত আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়, তথ্য বিনিময় ও পানি সম্পদ ব্যবহারের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

পলি ভরাট নিয়ন্ত্রণ

- দেশের নদ-নদীতে ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য নদী খনন করে পলি ভরাট নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।
- পলি ভরাট নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশব্যাপী বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

জলজ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- নদী, মোহনা এবং সমুদ্রের পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অপরিকল্পিতভাবে জলজ আবাসস্থলে বিভিন্ন বর্জ্য, রাসায়নিক পদার্থ, কলকারখানা বর্জ্য ফেলা রোধ করা প্রয়োজন। মৎস্য অধিদপ্তরকে, পরিবেশ ও বাণিজ্য অধিদপ্তর এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাসহ একযোগে কাজ করা আবশ্যক।
- দূষণ মাত্রা বিশ্লেষণ এবং যথাযথ বর্জ্য শোধন প্রক্রিয়া ছাড়া নতুন কোন কলকারখানা স্থাপন বা নিবন্ধন করা নিষিদ্ধ করা আবশ্যক।
- পানি দূষণের ফলে মৎস্য সেক্টরের ক্ষতি সম্পর্কে কৃষি, বাণিজ্য, পরিবেশ ও বন, বিদ্যুৎ ও খনিজ, বস্ত্র ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবহিতকরণ আবশ্যক।
- মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য উল্লেখিত মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে একত্রে কাজ করা এবং প্রয়োজনে স্মারক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করাও আবশ্যক।
- জলজ পরিবেশ দূষণ মোকাবিলা করার জন্য ESCAP (১৯৮৮) প্রণীত নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগকে অনুসরণ ও প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ২০ | দিন : ০৪ | মেয়াদকাল : ৬০ মিনিট

শিরোনাম : ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ইলিশ ও জাটকা মাছ ধরার নির্ভরশীলতা এবং পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা

লক্ষ্য : এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং ইলিশ ও জাটকা মাছ ধরার উপর তাদের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হবে যাতে তারা জেলেদের আর্থ সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষাণার্থীগণ-

- ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইলিশ ও জাটকা জেলেরা উক্ত মাছ ধরার ওপর কতটা নির্ভরশীল তা নির্ণয় করতে পারবেন;
- অভয়াশ্রম ঘোষণা, মৎস্য আহরণ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হলে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বিষয়সূচী	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা	স্বাগতম পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন; বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ও উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু	- ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোচনা; - জাতীয় দারিদ্র্য সূচকের সাথে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা; - ইলিশ ও জাটকা মাছ ধরার ওপর ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক নির্ভরশীলতা; - জাটকা মাছ ধরার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ; - ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা।	আলোচনা প্রশ্ন-বিরতি-নাম ও ফ্লিপচার্ট/ ট্রান্সপারেন্সি	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	- মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা; - উদ্দেশ্য যাচাই এবং - পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান।	প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, ডাস্টার, হ্যান্ডআউট।			

ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জাটকা মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীলতা এবং পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা

সূচনা :

বাংলাদেশে সাধারণত তিন প্রকারের ইলিশ জেলে রয়েছে। যথা :

ক) নৌকার মালিক (Boat owner)

খ) প্রধান মাঝি (Head mazhi) এবং

গ) ক্রু/নাবিক জেলে (Crew)

সাধারণত নৌকার মালিক, নৌকা ও জালের স্বত্বাধিকারী। সে প্রধান মাঝিকে মাছ ধরার জন্য নৌকা ও জাল দিয়ে থাকে। প্রধান মাঝি, সহকারী প্রধান মাঝি, নৌকা চালক ও নাবিক জেলেদের নিয়ে মাছ আহরণ করে থাকে। নৌকার মালিকগণ প্ররোক্ষভাবে ইলিশ আহরণের সহিত জড়িত বিধায় ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলতে মূলত দুই শ্রেণীর (প্রধান মাঝি ও নাবিক) জেলে পরিবারের আকার ও গঠন, শিক্ষার স্তর, খামার আয়তন, পেশা, কাজের অভিজ্ঞতা, বাৎসরিক আয় ইত্যাদি বিষয়কে নির্দেশ করে। এ বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলতে মূলত দুই শ্রেণীর (প্রধান মাঝি ও নাবিক) জেলে পরিবারের আকার ও গঠন, শিক্ষার স্তর, খামার আয়তন, পেশা, কাজের অভিজ্ঞতা, বাৎসরিক আয় ইত্যাদি বিষয়কে নির্দেশ করে। এ বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

পরিবারের আকার ও গঠন

পরিবার বলতে সাধারণত : একান্নভুক্ত সদস্যদেরকে বোঝায়। পরিবারের আকার ও গঠন নির্ভর করে পেশা ও আয়ের ওপর। সারণি-১৯.১ হতে দেখা যায় যে প্রধান মাঝির পরিবারের গড় আকার ৭.৭৯ জন যার মধ্যে পুরুষ ৪.৮১ জন ও মহিলা ২.৯৮ জন। আবার উক্ত পরিবারে ১৬ বছরের নিচের সদস্য সংখ্যা ২.৯১ জন এবং ১৬ বছরের বেশি বয়সের সদস্য সংখ্যা ৪.৭৯ জন। অন্যদিকে সাধারণ নাবিকদের পরিবারের গড় আকার ৬.৬৩ জন, যার মধ্যে পুরুষ ৩.৬৫ জন এবং মহিলা ২.৯৮ জন। নাবিকদের পরিবারে ১৬ বছরের নিচে সদস্য সংখ্যা গড়ে ১.৭০ জন এবং ১৬ বছর বয়সের ওপরে গড়ে ৪.৯৩ জন। ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পরিবারের গড় আকার বাংলাদেশের পরিবারের জাতীয় গড় আকার, ৪.৮ জন এর চেয়ে বেশ বড় (বি.বি.এস.২০০০)।

শিক্ষার স্তর

শিক্ষা, পেশা নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সারণি-১৯.১ হতে দেখা যায় যে, প্রধান মাঝি ও নাবিকদের একটি বড় অংশ নিরক্ষর (৬৩.৩ ও ৬২.৬১ ভাগ)। তাদের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিতের হার যথাক্রমে মাত্র শতকরা ৩০ এবং ২৮.৭১ ভাগ এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষিতের হার ৫ ও ৮.৬৭ ভাগ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষিতের হার নেই বললেই চলে।

খামার আয়তন

ইলিশ ও জাটকা জেলেগণ দেশের অত্যন্ত গরিব শ্রেণীভুক্ত জনগোষ্ঠী। তাদের অধিকাংশেরই ভিটামাটি নেই এবং তারা অন্যের জমিতে বসবাস করে। এমনকি অনেক জেলে পরিবার আছে যাদের কোন স্থায়ী বসতবাড়িও নেই। তারা বছরের অধিকাংশ সময় মাছ ধরার নৌকায় বাস করে। প্রধান মাঝি ও নাবিকদের খামারের গড় আয়তন যথাক্রমে ১.০১ একর এবং ০.৯৪ একর যার মধ্যে বাসস্থান যথাক্রমে ০.২১ একর এবং ০.০৭ একর। অবশিষ্ট অংশ বর্গা ও বন্ধক নেয়া এবং কিছু নিজস্ব জমি।

অভিজ্ঞতা

কোন পেশার মেয়াদই তার অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করে। সারণি-১৯.১ হতে দেখা যায় যে, শতকরা প্রায় ৬৯ ভাগ প্রধান মাঝি এবং ৩৫ ভাগ নাবিকের গড় অভিজ্ঞতা ১০ বছরের বেশি এবং ২৫ ভাগ প্রধান মাঝি এবং ২৭ ভাগ নাবিকের গড় অভিজ্ঞতা ১০ বছরের নিচে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রধান মাঝিদের গড় অভিজ্ঞতা নাবিকের চেয়ে বেশি যা স্বাভাবিকভাবে বাঞ্ছনীয়।

সারণি-১৯.১ : ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক চিত্র

	বিবরণ	প্রধান মাঝি	সাধারণ নাবিক
১।	পরিবারের গঠন ও আকার (জন)		
	গড় আকার	৭.৭৯	৬.৬৩
	পুরুষ	৪.৮১	৩.৬৫
	মহিলা	২.৯৮	২.৯৮
	১৬ বছরের নিচে বয়স	২.৯১	১.৭০
	১৬ বছরের উপরে বয়স	৪.৭৯	৪.৯৩
২।	শিক্ষা স্তর (%)		
	নিরক্ষর	৬৩.৩৩	৬২.৬১
	প্রাথমিক স্তর	৩০.০০	২৪.৭১
	মাধ্যমিক স্তর	৫.০০	৪.৬৭
	কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়	১.৬৬	-
৩।	খামার আয়তন (একর)		
	গড় আয়তন	১.০১	০.৯৪
	বাসস্থান	০.২১	০.০৭
	চাষযোগ্য জমি	০.৮১	০.৮৭
৪।	অভিজ্ঞতা (%)		
	০-৫ বছর	৬.৬৭	৩৮.২৬
	৬-১০ বছর	২৪.৫৮	২৬.৯৬
	১০ বছরের উপর	৬৮.৭৫	৩৫.৭৮
৫।	বাৎসরিক আয় (টাকা)	৩৯,০০০.০০	১৪,৪০০.০০

উৎস : চূড়ান্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ ফিশারিজ রিপোর্ট, ২০০১

পেশা

ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পেশায় ধরন দেশের সর্বত্র প্রায় একইরূপ। তবে তাদের পেশার বিশেষায়ণের সাথে পেশার ধরনে তারতম্য ঘটতে পারে। প্রধান মাঝি সম্পূর্ণরূপে ইলিশ ও জাটকা মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত। তার অন্য পেশায় নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ নেই বা থাকলেও তা এর চেয়ে লাভজনক নহে। তবে নাবিকদের মধ্যে পেশার কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। নাবিকগণ এ পেশার পাশাপাশি সুযোগ মতো অন্যান্য উপপেশা যেমন– কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দিনমজুর ইত্যাদির সহিত জড়িত। তবে কিছু উপপেশা লাভজনক হলেও মূলধন সমস্যার কারণে তারা সেগুলো করার সুযোগ পায় না।

বাৎসরিক আয়

কিছু সংখ্যক ইলিশ ও জাটকা জেলে বিভিন্ন ধরনের উপপেশায় নিয়োজিত থাকলেও তাদের আয়ের প্রধান উৎস হলো মৎস্য আহরণ। তবে তাদের বাৎসরিক আয় এলাকা ও মৎস্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। যেমন– চট্টগ্রামের একজন প্রধান মাঝি ও একজন নাবিক বছরে গড়ে প্রায় ৪৮,০০০.০০ টাকা ও ১৯,০০০.০০ টাকা আয় করে সেখানে দেশের অন্য সকল এলাকার প্রধান মাঝি ও নাবিকগণ বছরে গড়ে প্রায় ৩৯,০০০.০০ টাকা এবং ১৪,৪০০.০০ টাকা আয় করে।

ঋণ গ্রহণ

ইলিশ ও জাটকা জেলেগণ যেহেতু দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং নিম্ন আয়ের লোক তাই মূলধন গঠন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ কারণে মৎস্য আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, জীবিকা নির্বাহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি কাজের জন্য

সারণি-১৯.২ থেকে দেখা যায় যে প্রধান মাঝি ও নাবিকগণের পরিবারের আকার জাতীয় পরিবার আকারের চেয়ে বড় কিন্তু তাদের খামার আয়তন তুলনামূলকভাবে ছোট। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে নিরক্ষর বা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিতের হার সমান হলেও মাধ্যমিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলেরা অনেক পিছিয়ে। প্রধান মাঝিদের পরিবার প্রতি মাসিক আয় দেশের দরিদ্র শ্রেণীর সামান্য তুলনায় বেশি হলেও মাথাপিছু মাসিক আয় কম। কিন্তু নাবিকগণের ক্ষেত্রে এ দুই পরিমাণই অনেক কম অর্থাৎ যেখানে দেশের অন্যান্য দরিদ্র লোকের মাসিক আয় গড়ে ৩,০০৬ টাকা সেখানে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের গড় আয় মাত্র ১,৬৬৭ টাকা। আবার ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ নাবিকগণের ঋণের পরিমাণ কম হলেও প্রধান মাঝির ঋণের পরিমাণ অনেক বেশি। কাজেই সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর বাংলাদেশের গড় দারিদ্র্য অবস্থা অপেক্ষা নিম্নতর।

ইলিশ ও জাটকা মাছ ধরার ওপর ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক নির্ভরশীলতা

মৎস্য বিভাগের (DOF, 1994) মতে ইলিশ ও জাটকা জেলেগণ তাদের আহরিত মাছের ৫০ ভাগ নদী থেকে এবং ৪৮ ভাগ সমুদ্র থেকে আহরণ করে। অর্থাৎ এ সমস্ত জেলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইলিশ ও জাটকা মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত। দেশের প্রায় ১৪ লাখ জেলের ৫৫ ভাগ জেলে অভ্যন্তরীণ জলভাগে এবং ৩৬ ভাগ জেলে সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত (ইসলাম-১৯৯৭)। অতীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট বর্ণের লোকেরা এ পেশায় নিয়োজিত থাকলেও বর্তমানে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণ ইত্যাদি কারণে অনেক মুসলমানও ইলিশ ও জাটকা ধরাকে প্রধান পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং এর সহিত পরোক্ষভাবে জড়িত বা নির্ভরশীল নৌকার অধিকাংশ মালিকই হচ্ছে মুসলমান।

ইলিশ ও জাটকা জেলেদের কার্যসময় বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সে সমস্ত জেলে নদীতে মাছ ধরে তাদের শ্রম সময়ের প্রায় ৭০ ভাগ এ কাজে ব্যয় করে। বাকি ৩০ ভাগ সময় ব্যয় করে অন্যান্য কাজে। আবার যে সমস্ত জেলে সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ করে তারা তাদের শতভাগ শ্রম ও সময় এ কাজে ব্যয় করে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, দেশের ইলিশ ও জাটকা জেলেগণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ইলিশ ও জাটকা মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল এবং বিপুল সংখ্যক নৌকার মালিক পরোক্ষভাবে এর ওপর নির্ভরশীল।

ইলিশ মাছ ধরার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

কোন একটি কার্যক্রমের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বলতে মূলত এর আয় ও ব্যয়ের প্রকৃতি ও মাত্রাকে বোঝায়। নিম্নে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আয় ও ব্যয়ের প্রকৃতি ও মাত্রা আলোচনা করা হলো :

ইলিশ মাছ ধরার ব্যয় :

ইলিশ ও জাটকা জেলেদের খরচ বলতে মাছ ধরার জন্য ব্যয়িত অর্থকে নির্দেশ করে। এ খরচকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় (১) স্থির খরচ (Fixt cost): মাছ আহরণ না করলেও যে সমস্ত খরচ বহন করতে হয়। যেমন– যন্ত্রপাতির অবচয়, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, ঋণের সুদ ইত্যাদি (২) পরিবর্তনীয় খরচ (Variable cost) : মাছ আহরণ করলে যে সমস্ত খরচ বহন করতে হয় অন্যথায় নয়। এই পরিবর্তনীয় খরচই জাটকা জেলেদের মূল খরচ এবং এর উপাদানগুলো হলো নৌকা ভাড়া, ইঞ্জিন, জাল, শ্রম, জ্বালানি, বরফ বাবদ খরচ ইত্যাদি। কাজেই কোন এক মৌসুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সকল খরচের সম্মিলিত ফলই হলো ইলিশ ও জাটকা জেলেদের মাছ আহরণ খরচ। এই খরচ বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে সার্বিকভাবে বাংলাদেশে সমুদ্র থেকে ইলিশ ও জাটকা আহরণে গড় খরচ ৫,৬০,০০০ টাকা এবং নদী থেকে ইলিশ আহরণের গড় খরচ প্রায় ১, ৮৪, ০০০ টাকা। সমুদ্র থেকে ইলিশ আহরণের মধ্যে প্রায় ৩২.৫৫ ভাগ স্থির খরচ ও ৬৭.৪৫ ভাগ পরিবর্তনীয় খরচ এবং নদীর থেকে ইলিশ ও জাটকা আহরণের ক্ষেত্রে স্থির প্রায় ২৮.০ ভাগ ও পরিবর্তনীয় খরচ ৭২.০ ভাগ।

ইলিশ মাছ ধরার আয় :

জেলেদের আয় বলতে আহরিত মাছের বিক্রয়লব্ধ অর্থকে বোঝায়। জেলেদের এ আয় নির্ভর করে মাছের প্রাপ্যতা ও জালের প্রকৃতির ওপর। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ ইলিশ জেলেদের বাৎসরিক গড় আয় সমুদ্র ও নদী থেকে প্রায় যথাক্রমে ১৫,৯১,০০০.০০ টাকা এবং ৫,০৫,৬০০ টাকা এবং নিট আয় যথাকরমে ১০,৩১,০০০ টাকা ও ৩,২১,৬০০ টাকা। সমুদ্র ও নদী থেকে ইলিশ ও জাটকা মাছের আয় ও খরচ অনুপাত যথাক্রমে ২.৮৪ ও ২.৭৫। অর্থাৎ প্রতি ১ টাকা খরচের জন্য সমুদ্র থেকে মাছ আহরণে ২.৮৪ টাকা ও নদী থেকে ২.৭৫ টাকা আয় পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যায় ইলিশ মাছ আহরণে লাভের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। কিন্তু পক্ষপাতিত্বমূলক অংশীদারিত্বের কারণে সাধারণ এ মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয়। পৃথকভাবে জাটকা ধরার আয়-ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায়নি।

ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায় ঐতিহ্যগতভাবেই দরিদ্র। কিন্তু তাদের এ দারিদ্র্যতার মাত্রা সম্পর্কে খুব কম লোকই ওয়াকিফহাল। অন্য জেলেদের ন্যায় ইলিশ ও জাটকা জেলেদের অবস্থা একইরূপ। ইলিশ ও জাটকা ধরার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনটি

শ্রেণী জড়িত (নৌকার মালিক, প্রধান মাঝি ও নাবিক)। নৌকার মালিক তার নৌকা ও জাল প্রধান মাঝিকে ভাড়া দেয়। সাধারণ নাবিকগণ মাছ ধরে এবং প্রধান মাঝি তার তদারকি করে। ইলিশ ও জাটকা জেলেদের দারিদ্র্যতার মূল্যায়ণ করতে গেলে এ তিন শ্রেণীর লোকের আয় ও জাতীয় গড় আয়ের মধ্যে তুলনা করা অপরিহার্য।

সারণি-১৯.৩ : পরিবার প্রতি বাৎসরিক জাতীয় আয় (১৯৯৯) এবং ইলিশ ও জাটকা জেলেদের বাৎসরিক আয়

জাতীয় আয়/পরিবার (টাকা/বছর)			ইলিশ ও জাটকা জেলেদের গড় আয় (টাকা/বছর)		
জাতীয় গড়	দরিদ্র শ্রেণী	দরিদ্র নয়, এমন শ্রেণী	প্রধান মাঝি	নাবিক	নৌকার মালিক
৫৭,৭৪৪.০০	৩৮,৭৪৮০.০০	৭১,৬৫২.০০	৩৮,৯২৫.০০	১৪,৩৯৭.০০	২,৭৮,৩৯৮.০০

উৎস : বি.বি.এস. ১৯৯৯ এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট, বাংলাদেশের হিলশা ফিশারি গবেষণা, ২০০১

সারণি-১৯.৩ থেকে দেখা যায় নাবিক জেলেদের বাৎসরিক আয় মাত্র প্রায় ১৪৪০০ টাকা যা অন্য অন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের মাত্র ৩৭ ভাগ এবং জাতীয় আয়ের মাত্র ২৫ ভাগ এবং গরিব নয় এমন জনগোষ্ঠীর গড় বাৎসরিক আয়ের মাত্র ২০ ভাগ। তবে প্রধান মাঝির বাৎসরিক আয় অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় আয়ের সমান এবং গড় জাতীয় আয়ের ৫৭.৪০ ভাগ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ইলিশ ও জাটকা জেলেগণ বাংলাদেশের দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। যে সমস্ত ইলিশ ও জাটকা জেলেগণ প্রধান পেশা হিসাবে মাছ আহরণের ওপর নির্ভরশীল তাদের ৬০ ভাগ জেলের নিজস্ব কোন চাষযোগ্য জমি নেই, বাসস্থানের গড় আয়তন মাত্র ০.০৭ একর। এমনকি অনেক জেলের নিজস্ব বাসস্থানও নেই। তারা রাস্তার পাশে, খাস জমিতে, অথবা ভাড়া জমিতে বাস করে। তাদের ৬০ ভাগেরও বেশি লোক নিরক্ষর, তারা সম্পদহীন ও নিম্ন আয়ের শ্রেণীভুক্ত। বিকল্প কোন কাজ থেকে আয় উপার্জনও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাদের জীবিকা নির্বাহ তথা বেঁচে থাকার জন্য তারা ইলিশ ও জাটকা আহরণ করতে বাধ্য। এ কারণে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন করা অপরিহার্য।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ২১ | দিন : ০৪ | মেয়াদকাল : ৬০ মিনিট

শিরোনাম : **ইলিশ ও জাটকা জেলেদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুনর্বাসন এবং বিভিন্ন প্রকার বিকল্প কর্মসংস্থান**

লক্ষ্য : এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসনের বিভিন্ন উপায় এবং ইলিশ ও জাটকা জেলেদের বিকল্প কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যাতে তারা এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- চারা পোনা উৎপাদন, মৌসুমী পুকুর ও পোনা মাছ চাষ, বসত ভিটায় কৃষিকাজ, ক্ষুদে ব্যবসা, কুটির শিল্প ইত্যাদি বিকল্প কর্মসংস্থানে জেলেদের সম্পৃক্ত করার উপযোগিতার বিষয়ে অবহিত হবেন এবং উক্ত বিষয়সমূহে তাঁদের জ্ঞান নবায়ন করবেন;
- ইলিশ ও জাটকা জেলেদেরকে সরকারের প্রত্যক্ষ উন্নয়ন কর্মসূচী যেমন খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসংস্থান, ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড প্রদান এবং উক্ত প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্তকরণে সহযোগিতা করতে পারবেন।

বিষয়সূচী	*আলোচ্য বিষয়*	*পদ্ধতি*	*সময়*
ভূমিকা	স্বাগতম পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন; বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ও উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু	- ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর সংক্ষিপ্ত পুনবরালোচনা; - চারা পোনা উৎপাদন কাজে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের সম্পৃক্ত করণের পদ্ধতি চারা পোনা উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা; - মৌসুমী পুরুষ ও পেনে মাছ চাষে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের সম্পৃক্ত করার সম্ভাবনা এবং উক্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা।	আলোচনা প্রশ্ন-বিরতি-নাম ও ফ্লিপচার্ট	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	- মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা; - উদ্দেশ্য যাচাই এবং - পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান।	প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, ডাস্টার, হ্যান্ডআউট।			

ইলিশ ও জাটকা জেলেদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুনর্বাসন এবং বিভিন্ন প্রকার বিকল্প কর্মসংস্থান

ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন প্রয়োজন কেন?

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে আমাদের দেশের জেলেরা সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। কিন্তু খুব কম লোকই তাদের দারিদ্র্যসীমা ও দারিদ্রতার শুরু সম্পর্কে জানেন। কারণ তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য তেমন কোন কাজ করা হয় না। অন্য জেলেদের মতোই ইলিশ ও জাটকা জেলেরাও দরিদ্র। মাছ আহরণ করে ইলিশ জেলেরা পরিবার প্রতি বার্ষিক আয় করে মাত্র ১৪,৩৯৭ টাকা। উক্ত আয় পরিবার প্রতি বার্ষিক জাতীয় আয় (৫৭,৭৪৪ টাকা) হতে অনেক কম। সুতরাং ইলিশ জেলেরা সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র গোষ্ঠী যাদের পুনর্বাসন প্রয়োজন।

বিকল্প কর্মসংস্থান ও আয়মূলক কার্যক্রম

ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়মূলক কার্যক্রমের জন্য নিম্নে উল্লেখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে :

ক) মৎস্য চাষ

"ধরিব মৎস্য খাইব সুখে
কি আনন্দ লাগছে বুকে"
কিন্তু এখন আমাদের বলার সময় হয়েছে
"পালিব মৎস্য থাকিব সুখে
ধরিব মৎস্য মরিব দুঃখে"

শুধু মাছ ধরা আর খাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে এ আনন্দ চিরদিন থাকবে না। মৎস্য সম্পদ বিশাল হলেও অফুরন্ত নয়। কাজেই মাছের পরবর্তী প্রজন্ম রক্ষার জন্য সহনশীল পর্যায়ে আহরণ ও প্রয়োজনের মাছ আহরণ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে বেং বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে মৎস্য চাষে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে। যে সকল ইলিশ জেলেদের পুকুর ডোবা রয়েছে তারা সহজেই মাছ চাষ করতে পারেন। আর যাঁদের পুকুর নেই তাঁরা বাড়ির আশপাশে ছোট ছোট পুকুর ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করতে পারেন। এক্ষেত্রে খাস পুকুর-দীঘি কিংবা উপকূলবর্তী জলাশয় সহজ শর্তে ইলিশ জেলেদের মাঝে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইজারা দিয়েও তাদেরকে মাছচাষ, পোনা উৎপাদন ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এজন্য ইলিশ জেলেদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে পেনে মাছচাষ, খাঁচায় মাছচাষ, চিংড়ির পোনা উৎপাদন, পাঙ্গাশ মাছেরচাষ, তেলাপিয়ার চাষ প্রভৃতি বিকল্প কর্মে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এতে করে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মাছ চাষের কারিগরি প্রযুক্তি হস্তান্তরেও সহায়তা হবে এবং ছোট ছোট জলাশয়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে। সুযোগ মতো সকলে মাছচাষে আত্ম নিয়োগ করলে দেশে মাছের উৎপাদও বৃদ্ধি পাবে।

খ) বসতভিটার কৃষিকাজ (Homestead Agriculture)

প্রতিটি ইলিশ জেলের বাড়িতে একটি করে বাগানবাড়িতে পরিণত করতে হবে। প্রত্যেক জেলেবাড়ির আঙ্গিনার খালি জায়গায় শাক-সব্জি, লেবু, বেগুন, লাউ, মরিচ ইত্যাদির চাষ করে বাড়তি উপার্জন করা সম্ভব। এ কাজগুলো জেলে মহিলারা সহজেই করতে পারে এবং কম খরচে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জনও করতে পারে। এ কাজের অংশ হিসেবে গাছের চারা এবং শাক-সব্জির চারা উৎপাদনে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

গ) গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন

ইলিশ জেলেদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গরু-ছাগল পালন, গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। এতে করে বিকল্প কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে এবং জেলে মহিলারাও আয়-মূলক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সব্জি চাষের পাশাপাশি গৃহাঙ্গন হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, ছাগল পালন এবং গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচী বর্তমানে একটি জনপ্রিয় ও আয়বর্ধক কার্যক্রম। এতে হাঁস-মুরগির ও গরু-ছাগলের বর্জ্য, মাছচাষেও বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিষয়টি ইলিশ জেলেদের মাঝে সম্প্রসারণ করা এখন সময়ের দাবি।

ঘ) ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসা (Small Scale Business)

ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা যেমন– মুদির দোকান, চায়ের দোকান, পানের দোকান, শুঁটকি মাছের দোকান প্রভৃতি কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

ঙ) কুটির শিল্প (Cottage Industry)

কুটির শিল্পের উন্নয়ন বর্তমানে একটি জনপ্রিয় স্লোগান। ইলিশ জেলেরা স্বল্পব্যয়ে এ কাজটিতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে। এগুলোর মধ্যে বাঁশ-বেতের কাজ, কাঠ মিস্ত্রী, টেইলারিং, ঝিনুক নির্ভর হস্তশিল্প, লবণ ব্যবসা, মাছে লবণ দেয়া, শুঁটকি তৈরি জাল

তৈরি ও মেরামত, নৌকা মেরামত ইত্যাদি কাজ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে কুটির শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে ইলিশ জেলেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত রাখা সম্ভব।

চ) পরিবহন ব্যবসা (Transport Business)
ইলিশ জেলেরা সহজেই রিক্সা, ভ্যান, ট্যাম্পু ইত্যাদি পরিচালনা করে ফুলটাইম, কিংবা পার্ট-টাইম কর্মের ব্যবস্থা করতে পারেন।

সরকারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন
বাংলাদেশ সরকার দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এ সকল উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচীসমূহ "হিলশা অভয়াশ্রম" এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইলিশ জেলেদের মাঝে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন ঃ

ক) কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচী
জাটকা নিধন নিষিদ্ধ এলাকায় বিশেষ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীকে জোরদার করতে হবে।

খ) ভি.জি.ডি. ও ভি.জি.এফ কার্ড বিতরণ
জাটকা নিধন নিষিদ্ধকালীন সময়ে দরিদ্র ইলিশ জেলে পরিবারে ভি.জি.ডি এবং ভি.জি.এফ কার্ডের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করতে হবে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট এবং ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং কার্যক্রম বাংলাদেশে বেশ কয়েক বছর ধরে চালু রয়েছে। কিন্তু তার সামান্য অংশই জেলেদের জন্য বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। কাজেই জাটকা নিষিদ্ধকরণ এলাকায় এ কার্যক্রমকে বিশেষভাবে ইলিশ জেলেদের জন্য বাস্তবায়ন করতে হবে। এমনকি ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় এটাকে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে।

প্রস্তাবিত পুনর্বাসন প্রক্রিয়া (Proposed Rehabilitation Approaches)
দরিদ্র ও প্রকৃত জাটকা জেলেদের সংখ্যা নিরূপণ (Quantification of resource poor and actual Jatka Fishers)
বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪,৫০,০০০ ইলিশ জেলে রয়েছে এবং এদের মধ্যে ৬০-৭০% জাটকা ইলিশ ধরে থাকে। কাজেই জাটকা জেলের সংখ্যা হলো প্রায়, ২,৭০,০০০-৩,১৫,০০০। এরা দেশের ৩৯টি জেলার ১৪৪টি উপজেলার ১,৪১৯টি ইউনিয়নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে (GEF-Survey, 2002)। এদের সকলকে পুনর্বাসন করা সম্ভব নয়। কাজেই ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষিত এলাকায় পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত বেশি দরিদ্র ও ভালনারেবল গ্রুপের জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন করতে হবে।

পুনর্বাসনের জন্য দরিদ্র ও ভালনারেবল গ্রুপের জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন করতে হবে।
পুনর্বাসনের জন্য দরিদ্র শ্রেণী শনাক্ত করা অত্যন্ত জটিল বিষয়। কারণ গ্রাম এলাকার প্রায় সকলেই সরকারী সাহায্যের প্রত্যাশী। এ দিকে দরিদ্র জাটকা জেলেদের শনাক্ত করাও একটি কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে দরিদ্র জাটকা জেলেদের তালিকা তৈরির সময়ে কেউ স্বীকার করে না যে তারা জাটকা ধরে। কিন্তু সরকারী সাহায্যের কথা শুনলে সকলেই নাম তালিকাভুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সহায়তায় প্রকৃত জাটকা জেলেদের তালিকা প্রণয়নের কাজ করতে পারেন।

পুনর্বাসনের সময় কাল ও ব্যয়
প্রতিটি অভয়াশ্রম এলাকায় দরিদ্রতম জাটকা জেলেদের জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকরণ সময়ের জন্য পুনর্বাসন করতে হবে। প্রতি বছরের মার্চ-এপ্রিল মাসে এবং সর্বোচ্চ ২-৩ বছর প্রত্যেক অভয়াশ্রম এলাকায় পুনর্বাসন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
জাটকা জেলেদের পুনর্বাসনের জন্য ভিজিডি ও ভিজিএফ কার্ড ইস্যুটি বর্তমানে অধিক উপযোগী কার্যক্রম। এক্ষেত্রে কার্ডধারীদের প্রাপ্যের পরিমাণ ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় কিংবা মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপের সমান কিংবা অন্য কার্ড হোল্ডারদের সমান হতে পারে। সাধারণত বর্তমানে ভি.জি.ডি. এবং ভি.জি.এফ কার্ডে প্রতি মাসে ৩২ কেজি গম কিংবা আটা দেয়া হয়ে থাকে। গম কিংবা আটার পরিবর্তে ক্যাশ টাকা দেয়া হলে ৩২ কেজি গমের সমমূল্যের ক্যাশ টাকা দেয়া যেতে পারে।

পুনর্বাসনের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ (New Projects for Rehabilitation)
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবিষ্যতে "হিলশা অভয়াশ্রম" প্রতিষ্ঠার জন্য জাটকা জেলেদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে অভয়াশ্রম এলাকায় (Comprehensive) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে "জাটকা ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছে যা পরিকল্পনা কমিশনে দুই বছর যাবত চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের জি.ই.এফ কম্পোনেন্টের বাস্তবায়নাধীন বিশেষ করে চলমান কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত না করে প্রথমত অগ্রাধিকার দেয়া হবে। উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত কর্মপরিকল্পনা ও পূর্ব-অনুসরণীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

জাটকা জেলেদের পুনর্বাসনের জন্য চুম্বক কর্মপরিকল্পনা ও পূর্ব-অনুসরণীয় কার্যক্রম

চুম্বক কর্ম-পরিকল্পনা (Key Action Plan)

১. জাটকা জেলেদের বিশেষ করে "অভয়াশ্রম ও প্রজনন" এলাকায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. হিলশা ও জাটকা জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কার্যক্রমের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৩. "অভয়াশ্রম ও প্রজনন এলাকায়" সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক সর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. পুনর্বাসন কার্যক্রম অবশ্যই সমাজভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক হতে হবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ২২ | দিন : ০৪ | মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম : গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব ও বিভিন্ন উপায়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইলিশ সংরক্ষণ কাজে সম্পৃক্তকরণ

লক্ষ্য : এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীগণ ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব এবং বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে অবহিত হবেন। এ ছাড়া ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে কি ভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির কাজে সম্পৃক্ত করা যায় এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবেন।

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশনের শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- গণসচেতনতা সৃষ্টির বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে কিভাবে এ কাজে সম্পৃক্ত করা সম্ভব সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবেন।

বিষয়সূচী	*আলোচ্য বিষয়*	*পদ্ধতি*	*সময়*
ভূমিকা	স্বাগতম পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন; বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ও উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু	- ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব; - গণসচেতনতার সৃষ্টির মাধ্যম, ইলিশ জেলেদের মাঝে গণশিক্ষা ও স্বাক্ষরতা আন্দোলনের বিস্তার - রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বিলবোর্ড, ওয়েবসাইট, অডিও-ভিডিও, ডকুমেন্টরি চলচিত্র ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি; - বিভিন্ন প্রকার মুদ্রিত দ্রব্যাদি (বুকলেট, লিফলেট, পোস্টার, নিউজলেটার, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি) প্রস্তুত ও বিতরণ - গণসংযোগ (মাইকিং, ঢোলশহরৎ, নাটক, বিজ্ঞাপন, গান); - প্রত্যক্ষ সংযোগ (সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, - ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন; - মৎস্য পক্ষ/সপ্তাহ, মৎস্য মেলার আয়োজন, রচনা ও কবিতা প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ইলিশ মাছের সংযোগ স্থাপন; - বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে সম্পৃক্ত করার পদ্ধতি। - মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা, উদ্দেশ্য যাচাই এবং - পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান	আলোচনা প্রশ্ন-বিরতি-নাম ও ফ্লিপচার্ট	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	- মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা; - উদ্দেশ্য যাচাই এবং - পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান।	প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, ডাস্টার ও হ্যান্ডআউট।			

গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব ও বিভিন্ন উপায়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইলিশ সংরক্ষণ কাজে সম্পৃক্তকরণ

ইলিশ আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী সম্পদ। কিন্তু আমরা যেমন– দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝি না তেমনি বাজারে ইলিশের প্রাচুর্যতা থাকা পর্যন্ত তার প্রতি যত্নবান হইনি। আর যত্নবান না হওয়ার কারণে ইলিশ আজ হুমকির সম্মুখীন। তাই ইলিশের উৎপাদনকে সহনশীল ও বৃদ্ধির জন্য এর অবদান সম্পর্কে সকল স্তরের জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

গণসচেতনতা সৃষ্টির বিভিন্ন পদ্ধতি

১) ইলিশ জেলেদের মাঝে গণশিক্ষা ও স্বাক্ষরতা আন্দোলনের বিস্তার

অধিকাংশ ইলিশ মৎস্যজীবিই অশিক্ষিত। শ্রমিক মৎস্যজীবিদের (Crew Fishers) স্বাক্ষরতার হার মাত্র ৩৭%। গণশিক্ষার বিস্তার তাদেরকে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব এবং জাটকা নিধনের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ও সাবধান হতে সাহায্য করবে। বিকল্প জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করলে তারা নিজেরাই আর জাটকা ধরবে না। অধিকাংশ জাটকা জেলেই ইলিশ ধরে। তাই তাদেরকে বুঝাতে এবং শেখাতে হবে যে, "জাটকাই হচ্ছে ভবিষ্যত ইলিশ, তাই যদি জাটকা ধরা হয় তবে ইলিশ হারিয়ে যাবে"।

যেহেতু মৎস্য অধিদপ্তরের গণশিক্ষা বা স্বাক্ষরতা আন্দোলন বিস্তারের নিজস্ব কোন মাধ্যম (Mechanism) নেই, তাই গণশিক্ষার বিস্তার ও স্বাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচীর জন্য এনজিও নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার দেশে গণশিক্ষা এবং স্বাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ নজর দিয়েছে। তাই মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার ওপর গুরুত্বসম্পন্ন বিশেষ কর্মসূচী হাতে নেয়া ও বাস্তবায়ন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে পারে।

২। বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যবহার করে সচেতনতা সৃষ্টি

ইলিশ সম্পদ এবং ইলিশ/জাটকা আইন ও বিধি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিম্নের মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা যায়–

গণমাধ্যম

ইলিশ জেলে, ব্যবসায়ী এবং ইলিশ শিল্পে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্তরের মানুষের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহার করা যায়। যেমন– টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, বিলবোর্ড, ওয়েবসাইট/সিডি, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি। রেডিও, টেলিভিশনে নাটক/নাটিকা বা কুইজ, সংবাদপত্রের কুইজ বা শব্দজব্দ, বিলবোর্ডের সাধারণ প্রযুক্তিগত তথ্য, ভিডিও এর মাধ্যমে প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রকাশ করে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি, সাধারণ প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া যায়। ইলিশ/জাটকা সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ চলচ্চিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচিত্র বা ডকুমেন্টারি চলচিত্র তৈরি করে গণমাধ্যমে বিশেষ করে টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান যেমন- "মাটি ও মানুষ", "ক্ষেতে খামারে" ইত্যাদিতে প্রচার করা যায়।

৩) মুদ্রিত দ্রব্যাদি

বিভিন্ন ধরনের মুদ্রিত দ্রব্যাদি যেমন পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট, নিউজলেটার, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি প্রস্তুত করে জেলে ও ব্যবসায়ী, প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গের নিকট বিতরণ করা যেতে পারে। এই সব মুদ্রিত দ্রব্যাদি দ্বারা আইন ও নীতি, পদ্ধতি বা তার গাইড লাইন, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি ও সাধারণ তথ্যসমূহ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায়।

৪) গণসংযোগ

মাইকিং, প্রচলিত ঢোল সহরত, নাটক, বিজ্ঞাপন, লোকগীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। বিশেষ করে লোকসঙ্গীত ও নাটকের মাধ্যমে স্থানীয় কারিগরি জ্ঞান ব্যবহার করে সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন করা যায়।

৫) প্রত্যক্ষ সংযোগ

প্রত্যক্ষ সংযোগ সচেতনতা সৃষ্টির একটি খুবই কার্যকরী মাধ্যম। সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, দলীয় আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। এসব মাধ্যম দ্বারা আইন ও নীতি, পদ্ধতি, পরিবেশ বিষয়ক ইস্যু, সম্পদ সংরক্ষণ, স্থানীয় কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে জনগণকে সচেতন করা যায়। এ ধরনের সভা, সেমিনারে শুধুমাত্র ইলিশ/জাটকা জেলে বা ইলিশ ব্যবসায়ীই নয় বরং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার এখন স্থানীয় সরকার প্রশাসন পুনর্গঠন করতে যাচ্ছে- অচিরেই গ্রামসরকার গঠন করা হতে পারে। অন্যদের সাথে গ্রাম সরকারকে ইলিশ/জাটকা সংরক্ষণের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির মোক্ষম কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৬) মৎস্য পক্ষ / মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন

এ সময় ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ইলিশ/জাটকা ও সম্পদ এবং তা সংরক্ষণের গুরুত্ব, আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা যায়।

৭) মৎস্য মেলার আয়োজন

বিভিন্ন সময়ে মৎস্য মেলার আয়োজন করে জনগণের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। এ ধরনের মেলায় সকল শ্রেণীর মানুষের সমাগম ঘটে। মেলায় জারীগান, ভিডিও, অডিও ইত্যাদি ব্যবস্থা করে জনগণকে সচেতন করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পহেলা বৈশাকে মেলা হয়ে থাকে। সে মেলাতেও এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায়।

৮) রচনা ও কবিতা প্রতিযোগিতা

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ইলিশ সম্পদ, জাটকা নিধনের ধ্বংসাত্মক প্রভাব এবং এ সম্পদ রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রচনা ও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়।

৯) সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ইলিশ মাছের সংযোগ স্থাপন

পান্তা ইলিশ অনুভূতি

প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা হয়। সে মেলায় বাংলাদেশের মানুষ পান্তা ইলিশ খেয়ে থাকে। ইলিশের প্রাচুর্যতা কমলেও গ্রামবাংলার মানুষের পান্তা-ইলিশের প্রতি এখনও দুর্বলতা রয়ে গেছে। তাই বৈশাখী মেলার সময় এবং রেডিও-টেলিভিশনে পান্তা-ইলিশ এবং ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কিত নাটক-নাটিকা, জারীগান, গম্ভীরা ইত্যাদি প্রচারের মাধ্যমে জনগণের অনুভূতি জাগ্রত করে এ সম্পদ রক্ষা/বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে সম্পৃক্ত করার পদ্ধতি

সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন, মৎস্য মেলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে ইলিশ সংরক্ষণ কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এ ছাড়া ইলিশ সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কমিটি ও কার্যক্রমের ইলিশ জেলে, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে ইলিশ সংরক্ষণে সম্পৃক্ত হবে এবং অধিকতর সুফল পাওয়া যাবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ২৩ | দিন : ০৪ | মেয়াদকাল : ৬০ মিনিট

শিরোনাম : **ইলিশ ও ঝাটকা জেলেদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুনর্বাসন এবং বিভিন্ন প্রকার বিকল্প ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও জনবল অবকাঠামো, ইলিশ জোন এবং ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও অন্যান্য কমিটি**

লক্ষ্য : এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীগণকে ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় জনবল ; বর্তমান ইলিশ জোন ও ইলিশ জোনের পরিসীমা বর্ধিতকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও অন্যান্য কমিটি এবং কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে অবহিত করা হবে যাতে তারা উক্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ—

- বর্তমান ইলিশ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সুষ্ঠুভাবে ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন ;
- বর্তমান ইলিশ জোন সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রস্তাবিত জোন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানের জাতীয় কমিটি ও প্রস্তাবিত অন্যান্য কমিটি এবং বিভিন্ন কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।

বিষয়সূচী	*আলোচ্য বিষয়*	*পদ্ধতি*	*সময়*
ভূমিকা	স্বাগতম পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন; বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ও উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু	- ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান তথা মৎস্য অধিদপ্তরের বর্তমান কর্মপরিধি ও জনবল কাঠামো; - জনবলের অপ্রতুলতা ও প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো; - ইলিশ জোন বর্দ্ধিতকরণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রস্তাবিত ইলিশ জোন; - ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত জাতীয় ও অন্যান্য কমিটি এবং কমিটির কার্যপরিধি।	আলোচনা প্রশ্ন-বিরতি-নাম ও ফ্লিপচার্ট	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	- মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা; - উদ্দেশ্য যাচাই এবং - পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান।	প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, ডাস্টার, হ্যান্ডআউট।			

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের জনবল, অবকাঠামো ইলিশ জোন, ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও অন্যান্য কমিটি

ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার সার্বিকভাবে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ অধিদপ্তর, দপ্তর ও অন্যান্য সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণসহ গবেষণা কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে এ সকল কার্যক্রম বাংলাদেশের তিনটি প্রতিষ্ঠান যথা : মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বাস্তবায়ন করে আসছে। মৎস্য অধিদপ্তর দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ; বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য গবেষণা কাজ এবং মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বিপণন (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক), প্রক্রিয়াকরণ এবং কিছু কিছু জলাশয় ব্যবস্থাপনাও করে থাকে। দেশের অন্যান্য মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে যুগপৎভাবে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর, ইলিশ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

এ ছাড়াও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (NGO) ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করে আসছে। ইলিশ মূলত এদেশের জনগণের সম্পদ। তাই এর উন্নয়ন ও সংরক্ষণের অন্যতম দায়-দায়িত্ব এ দেশের আপামর জনগণ এবং সরকারের।

মৎস্য অধিদপ্তরের বর্তমান জনবলের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় জনবল

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের পৃথকভাবে কোন অবকাঠামো বা জনবল নেই। অন্যান্য কর্মকান্ডের সাথে অধিদপ্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। অধিদপ্তরের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রধান কার্যালয় হতে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বর্তমানে নিয়োজিত ও প্রয়োজনীয়/ প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো নিম্নের সারণি-২২.১ এ দেখানো হলো :

সারণি-২২.১ ঃ মৎস্য অধিদপ্তরের বর্তমান জনবলের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় জনবল

পর্যায়	পদ/Set-up	বর্তমান পদ Set-up	প্রস্তাবিত নতুন পদ Set-up	প্রস্তাবিত করণীয় কাজ
সদর দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর	ইলিশ ডিভিশন	নাই	হিলশা ডিভিশন সৃষ্টি	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে পরিচালক অভ্যন্তরীণ/ সামুদ্রিক এর অধীনে একটি ইলিশ ডিভিশন সৃষ্টি করা।
সদর দপ্তর, এফ আর এস এস ইউনিট	পিএসও, মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা (ইলিশ)	নাই	ইলিশসহ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিএসও পদমর্যাদার একটি পদ সৃষ্টি করা	অন্যান্য কার্যক্রমের সহিত ইলিশের কাজ দেখাশোনার জন্য প্রকল্পের আওতায় মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য পি এস ও পদ সৃষ্টি করা।
বিভাগ	মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা	উপ-পরিচালক-১ সহকারী পরিচালক-১	সহকারী পরিচালক-২ (মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা)	অন্যান্য কার্যক্রমের সহিত ইলিশের কাজ পরিচালনার জন্য মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সহকারী পরিচালকের (AD-2) পদ সৃষ্টি করা।
জেলা	মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা-১ জরিপ কর্মকর্তা-১	মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-১	অন্যান্য কার্যক্রমের সহিত ইলিশের কাজ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনায় প্রথম শ্রেণীর পদ মর্যাদার একটি পদ সৃষ্টি করা।
উপজেলা	মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা	সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-১ সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা-১	মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা-২	ইলিশ সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট উপজেলায় মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তার একটি পদ সৃষ্টি করা।

বর্তমানে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ উপজেলা হতে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং সদর দপ্তরে উপ-পরিচালক (সম্প্রসারণ) নির্বাহ করেন। অতঃপর উক্ত কাজ পরিচালক প্রশাসনের মাধ্যমে মহাপরিচালক কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। মৎস্য সম্পদ জরিপ (FRSS) বিভাগের মাধ্যমে ইলিশ উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সার্বিকভাবে ইলিশ বা মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য কোন বিভাগ নেই। এ প্রেক্ষাপটে ইলিশসহ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সার্বিক কাজের জন্য সদর দপ্তরে একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার পদ , বিভাগীয় পর্যায়ে একজন সহকারী পরিচালক, জেলা পর্যায়ে একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ এবং উপজেলা পর্যায়ে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা (উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা) সৃষ্টি করা অতীব প্রয়োজন। এ ছাড়া ইলিশ কার্যক্রমকে মাঠ পর্যায়ে বিস্তার করার জন্য যে সকল ইউনিয়নে ইলিশ মাছের গুরুত্ব আছে সে সকল ইউনিয়নে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তার সম পদমর্যাদায় একজন করে ইউনিয়ন মৎস্য পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

এ ছাড়া সদর দপ্তরে চিংড়ি সেলের মতো একটি হিলশা সেল অথবা হিলশা ডিভিশন সৃষ্টি করার জন্য ইতোমধ্যে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। উপরে উল্লেখিত পদ সৃষ্টিসহ সদর দপ্তরে একটি হিলশা সেল বা ডিভিশন সৃষ্টি করা হলে সার্বিক ইলিশ ব্যবস্থাপনায় গতি সঞ্চারিত হবে।

ইলিশ গবেষণায় নিয়োজিত বর্তমান ও প্রয়োজনীয় জনবল

ইলিশ গবেষণার প্রধান দায়িত্ব বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে ইতোমধ্যে কয়েকটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করা হয়েছে। ইলিশের ওপর গবেষণা কাজ সাধারণত উন্নয়ন প্রকল্প এবং দাতা সংস্থার সাহায্য নির্ভর। নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণা কাজের জন্য ইনস্টিটিউটের কোন তহবিল নেই। একইভাবে গবেষণার জনবলও অত্যন্ত সীমিত, সাধারণত প্রকল্পনির্ভর। মাত্র ২-৩ জন রাজস্ব খাত ভুক্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা গবেষণা প্রকল্প প্রাপ্তি সাপেক্ষে গবেষণা কাজ পরিচালনা করা আবশ্যক । এ ছাড়া ইলিশ গবেষণা কাজ জোরদার করার জন্য মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্রে হিলশা রিসার্চ টিম নামে একটি স্থায়ী দল বা গ্রুপ সৃষ্টি করাও আবশ্যক। একই সাথে ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র হতে সামুদ্রিক ইলিশের বিভিন্ন বিষয় যেমন– প্রোডাক্ট উন্নয়ন কোটীজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কাজ করা আবশ্যক। বর্তমানে গবেষণা কাজের জন্য নিয়োজিত জনবল ও প্রয়োজনীয় জনবল সারণি-২২.২ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-২২.২ : ইলিশ গবেষণায় বর্তমানে নিয়োজিত জনবল ও প্রয়োজনীয় জনবল

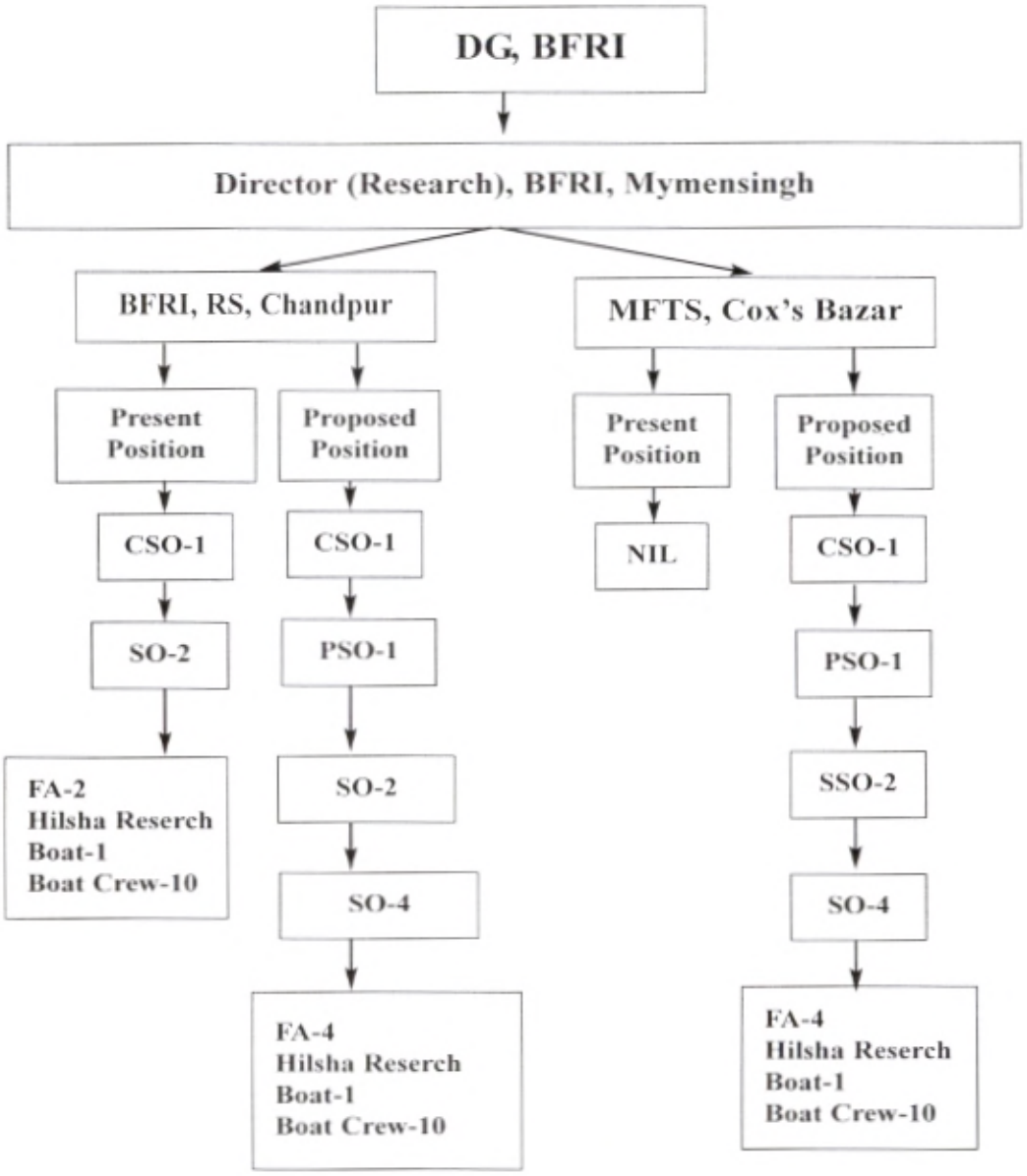

ইলিশ জোন, ইলিশ জোন বর্ধিতকরণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রস্তাবিত ইলিশ জোন

ইলিশ একটি অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন মাছ গণ্য হওয়া সত্ত্বেও ইতোপূর্বে পৃথকভাবে এর স্বকীয়তা দেখা হয়নি। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশের যে সকল এলাকা ইলিশ সম্পদ বিস্তৃত সে সব এলাকা নিয়ে একটি অঞ্চল বা জোন গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে প্রেক্ষাপটে ১৯৯৫ সালের ২০ শে জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইলিশ মাছের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য নিম্নে বর্ণিত ১০টি জেলার সমন্বয়ে ২টি জোন গঠন করে।

জোন-১ : কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, ও মুন্সীগঞ্জ।
জোন-২ : ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও পিরোজপুর।

উপরে বর্ণিত ইলিশ কতিপয় জেলা যথা-রাজশাহী, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ঝালকাঠি, খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, নোয়াখালী, বাগেরহাট ইত্যাদি অন্তভুক্ত করা হয়নি। এই সমস্ত জেলাসমূহেও জাটকা ধরা ও বিক্রি এবং ইলিশ মাছের নার্সারি ক্ষেত্রের আওতার্ভুক্ত করা আবশ্যক এবং ২টি ইলিশ জোনের পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত ছকে ২৭টি জেলাকে নিয়ে ৫টি ইলিশ জোন গঠন করার জন্য হিলশা ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট এ্যাকশন প্ল্যানে প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান ও প্রস্তাবিত ইলিশ জোন

বর্তমান ইলিশ জোন		প্রস্তাবিত ইলিশ জোন	
জোন নং	জেলার নাম	জোন নং	জেলার নাম
১	কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, মুন্সীগঞ্জ	১	কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী
২	ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর	২	ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি
৩	--	৩	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী
৪	--	৪	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা
৫	--	৫	রাজশাহী, নওয়াবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা

উপরোক্তটি প্রস্তাবটি বিস্তারিত আলোচনা শেষে রাজশাহী বিভাগের ৫টি জেলায় ইলিশ ও জাটকার গুরুত্ব অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ায় ৫টি জোনের পরিবর্তে ১ নং হতে ৪ নং পর্যন্ত মোট ২২টি জেলা নিয়ে ৪টি ইলিশ জোন গঠনের প্রস্তাব মৎস্য অধিদপ্তরে নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, সহসাই বর্তমান ২টি ইলিশ জোন ৪টি জোনে সম্প্রসারিত হবে।

ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানের জাতীয় কমিটি ও প্রস্তাবিত অন্যান্য কমিটি এবং বিভিন্ন কমিটির কার্যপরিধি

জাতীয় কমিটি ও তার কার্যপরিধি

ইলিশ সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশে বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে একটি ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। কমিটির রূপরেখা নিম্নরূপ ঃ

মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
প্রতিনিধি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয়	ঐ
প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয়	ঐ
প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ঐ
প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়	ঐ
প্রতিনিধি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ঐ
প্রতিনিধি, নেভাল কোর্স ও কোস্টগার্ডস	ঐ
প্রতিনিধি, স্বনামধন্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও)	ঐ
মহাপরিচালক/ প্রতিনিধি, কোস্টগার্ড	ঐ
মহাপরিচালক, বিএফআরআই	ঐ
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

- পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ;
- কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- জাতীয় ও নিম্ন পর্যায়ে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- মৎস্য আইন বাস্তবায়নে সফলতার জন্য জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তির অনুমোদন;

প্রস্তাবিত কমিটি

হিলশা ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা (HFMAP) এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মসূচীর পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো (Organizational Set up) উন্নয়ন/ সৃষ্টি করা অতীব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো এবং হিলশা ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পদ্ধতি হবে বিকেন্দ্রীকৃত সমাজভিত্তিক বাস্তবায়ন কৌশল (Approach) যা ইলিশ আহরণকারী ও ইলিশ ব্যবসায়ীদের সার্বিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো

হিলশা ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামোর নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকতে হবে ঃ

- হিলশা ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় পরিষদ বা জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে। এই জাতীয় পরিষদ বা জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ ইলিশ কর্মসূচী বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করবে।

- মৎস্য অধিদপ্তর হবে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় HFMAP বাস্তবায়ন করবে।

- দেশের সকল ধরনের হিলশা ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয়ের জন্য একটি জাতীয় হিলশা ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী তৈরি করতে হবে।

- কর্মসূচী বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামোর কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হিলশা ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা সমন্বয়কারি থাকতে হবে। হিলশা ফিশারি বাস্তবায়নের জন্য একটি দল গঠন করতে হবে এবং প্রশিক্ষিত ও দক্ষ অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী, হিলশা মূল্যায়নকারী এবং তৃণমূল পর্যায়ের প্রকৃত মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে এই দল গঠিত হবে।

- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ HFMAP ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করবেন। তারা মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষিত করবেন এবং কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং সহনীয় পর্যায়ে উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য সকল প্রাসঙ্গিক কাজের ফলো-আপ করবেন।

  উপরে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

কমিটির নাম, সদস্য ও তাদের কর্মপরিধি নিম্নে ছকে দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	কমিটির রূপরেখা	কর্মপরিধি ও দায়িত্ব
	ইউনিয়ন/মহল্লা HFM কমিটি (সমাজভিত্তিক)	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ইউপি - - - - - -সভাপতি সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য - - - - - - - - -সদস্য গ্রাম সরকার সদস্য - - - - - - - - - -ঐ মৎস্যজীবী প্রতিনিধি - - - - - - - - -ঐ মৎস্য ব্যবসায়ী প্রতিনিধি - - - - - - - -ঐ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যসচিব -ঐ মৎস্যজীবী মনোনীত প্রতিনিধি - - -সদস্য সচিব	- মৎস্য আইন ও HFMAP বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান - পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন - সচেতনতা সৃষ্টি ও শিল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা - স্থানীয় সংকট নিরসন - উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও এনজিওসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন - উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে কাজের প্রতিভাব দেয়া - মাসিক সভার আয়োজন করা - সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রমের অব্যাহত ধারা নিশ্চিত করা
২	উপজেলা HFM কমিটি	মাননীয় সদস্য বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি - - - - - - - - -উপদেষ্টা উপজেলা নির্বাহী অফিসার - - - - -সভাপতি ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা - - - - - - -সদস্য উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা - - - - - -সদস্য মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধি - - - - -সদস্য মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি - -সদস্য এনজিও প্রতিনিধি - - - - - - - - - -সদস্য সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ------সদস্য সচিব	- ইউনিয়ন/মহল্লা কমিটি গঠন - গ্রাম কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ - সচেতনতা সৃষ্টি - মৎস্য আইন বাস্তবায়ন, পুনর্বাসন কর্মসূচী ত্বরান্বিতকরণ, বিকল্প কর্মসংস্থান, মৎস্য চাষ বৃদ্ধি, ইলিশ ও জাটকা আহরণ পর্যবেক্ষণ - ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা - অন্যান্য কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন - মাসিক সভার আয়োজন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন - সফল মৎস্য অইন বাস্তবায়নকারীকে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য সুপারিশকরণ।
৩	জেলা HFM কমিটি	মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা সংসদ সদস্য অথবা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি - - - - - - - - -উপদেষ্টা জেলা প্রশাসক - - - - - - - - - - -সভাপতি পুলিশ সুপার - - - - - - - - - - -সদস্য জেলা সমবায় কর্মকর্তা - - - - - - - -সদস্য মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি - -সদস্য এনজিও প্রতিনিধি - - - - - - - - - -সদস্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা----------সদস্য সচিব	- উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও অন্যান্যদেরকে প্রশিক্ষণ দান - উপজেলার HFM কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ - ইলিশ অভয়াশ্রমের ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ - অন্যান্য কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন - মাসিক সভার আয়োজন প্রতিবেদন প্রণয়ন - জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য সুপারিশকরণ।
৪	জাতীয় HFM উপদেষ্টা কমিটি	মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়--সভাপতি সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় ---- সভাপতি সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়----সহ-সভাপতি প্রতিনিধি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় - - - - -সদস্য প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - - - - - -ঐ প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - - - - - -ঐ প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয় - - - - - - -ঐ প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় - - - - - -ঐ প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয় - - - - - - -ঐ প্রতিনিধি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় - - - -ঐ প্রতিনিধি, নেভাল ফোর্স ও কোস্টগার্ডস ঐ প্রতিনিধি, স্বনামধন্য এনজিও - - - - -ঐ মহাপরিচালক/প্রতিনিধি, কোস্টগার্ড - -ঐ মহাপরিচালক, বিএফআরআই - - - - -ঐ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর --------সদস্য সচিব	- পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতিনির্ধারণ। - কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। - জাতীয় ও নিম্ন পর্যায়ে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন। - মৎস্য আইন বাস্তবায়নে সফলতার জন্য জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তির অনুমোদন।

পঞ্চম দিন - অধিবেশন পরিকল্পনা ও হ্যান্ডআউট

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ২৪ | দিন: ০৫ | মেয়াদকাল : ৬০ মিনিট

শিরোনাম : ইলিশ মাছের গবেষণায় সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান, সম্পাদিত ও প্রয়োজনীয় গবেষণা কাজ এবং জনবল

লক্ষ্য : এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশ ইলিশ গবেষণায় সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান, সম্পাদিত গবেষণা কাজ এবং ভবিষ্যতে সম্পাদনযোগ্য গবেষণা কাজের বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হবে যাতে প্রয়োজনে তথ্য আদান-প্রদান ও পরস্পর যোগাযোগ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ—

- বাংলাদেশ ইলিশ গবেষণায় সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন;
- ইতোপূর্বে সম্পাদিত এবং বর্তমানে পরিচালনাধীন গবেষণা কাজ সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ সুদৃঢ় এবং তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবেন;
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিষয়ে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচী	*আলোচ্য বিষয়*	*পদ্ধতি*	*সময়*
ভূমিকা	স্বাগতম পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন; বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ও উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু	- বাংলাদেশ ইলিশ গবেষণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; - ইলিশ গবেষণায় সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান; - পূর্বে সম্পাদিত গবেষণা কাজ ও প্রয়োজনীয় গবেষণা কাজ; - গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জনবল উন্নয়ন (হিলশা রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ধারণা); - গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের বর্তমান অবস্থা ও করণীয় কাজ।	আলোচনা প্রশ্ন-বিরতি-নাম ও ফ্লিপচার্ট	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	- মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা; - উদ্দেশ্য যাচাই এবং - পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান	প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, ডাস্টার, হ্যান্ডআউট।			

ইলিশ মাছের গবেষণায় সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান, সম্পাদিত ও প্রয়োজনীয় গবেষণা কাজ

বাংলাদেশে ইলিশ মাছের গবেষণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশে মাছের ওপর গবেষণা কাজ শুরু হয় মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে কুমিল্লার চাঁদপুরে Fresh Water Fisheries Research Station (FWFRS) এবং Fisheries Technology Station (FTS) সৃষ্টির মাধ্যমে। FWFRS এবং FTS সীমিত আকারে বিভিন্ন গবেষণা কাজের সাথে ইলিশ মাছের ওপরও বেশ কিছু গবেষণা কাজ পরিচালনা করে। তবে ১৯৮৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে ইলিশ মাছের ওপর কোন নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা কাজ সম্পাদিত হয়নি। ১৯৮৫ সালে FAO এবং UNDP এর আর্থিক সহায়তায় BOBP (Bay of Bengal Programme) অধীনে এক বছর মেয়াদী একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর IDRC (International Development Research Center of Canada) এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে" ইলিশ মাছ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা" শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকল্প ১৯৮৬ সাল হতে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে পরিচালিত হয়। উক্ত প্রকল্প শেষে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত সীমিতভাবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্তৃক ইলিশ মাছের গবেষণার কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছিল।

অতঃপর ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ACIAR (Australian Center for Industrial and Agricultural Research) এর পূর্ণ আর্থিক সহায়তায় এবং CSIRO (Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation এর Marine laboratory, Australia এর কারিগরি সহায়তায় Hilsha Fisheries Research in Bangladesh শিরোনামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ইলিশের ওপর গবেষণা কাজ করা হয়।

এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্স, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হতে মৎস্য সম্পদের ওপর কিছু গবেষণা কাজ বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত হয়ে আসছে যার মধ্যে ইলিশ গবেষণাও অন্তর্ভুক্ত আছে।

ইলিশ গবেষণায় সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োগিক গবেষণা কাজের প্রধান দায়িত্ব বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের। উক্ত ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে প্রধানত ইলিশ গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে।
উক্ত কেন্দ্রের Hilsha Research Team-এর কয়েকজন বিজ্ঞানী ইলিশ মাছের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে আসছেন। তা ছাড়া উপরের অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইলিশের ওপর গবেষণা করে থাকে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত মৎস্য অধিদপ্তর হতেও বিভিন্ন প্রকল্পের সম্পৃক্ততায় বিশেষত ইলিশ মাছের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক কিছু কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তরের ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের (FFP)-এর GEF Component কর্তৃক Hilsha Fish Management and Development শীর্ষক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমেও ইলিশ মাছের ওপর প্রায়োগিক গবেষণা কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

সম্পাদিত গবেষণা কাজ

উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ইলিশ মাছের জীববিদ্যা, খাদ্য ও খাদ্যাভাস, পপুলেশন ডিনামিক্স, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিরূপণ এবং **racial study** ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গবেষণা কাজ পরিচালনা করেছে।
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের এ পর্যন্ত ৩টি গবেষণা প্রকল্প যথা BOBP এর অধীনে এক বছর মেয়াদী গবেষণা প্রকল্প, "ইলিশ মাছ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা" শিরোনামে গবেষণা প্রকল্প এবং "বাংলাদেশে ইলিশ মাছের গবেষণা" শিরোনামে গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ সব গবেষণা প্রকল্পের কাজের ফলাফল বিভিন্ন সময়ে জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং মূল্যবান সুপারিশমালাও গৃহীত হয়েছে। গবেষণা প্রকল্পের কাজের ফলাফল বিভিন্ন সময়ে জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং মূল্যবান সুপারিশমালাও গৃহীত হয়েছে। গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে লব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে Hilsha Fisheries Management Action Plan for Bangladesh শিরোনামে একটি ব্যবস্থাপনা নীতিমালাও প্রস্তুত করা হয়েছে, যা চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এ যাবতকালে গবেষণার মাধ্যমে যে সব বিষয়ে গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়গুলো হলো:

- প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা;
- জাটকা আহরণের মৌসুম;
- জাটকা আহরণের জাল ও সরঞ্জামাদি ইত্যাদি।

এ ছাড়া নিম্নে বর্ণিত বিষয়েও গবেষণা কাজে অগ্রগতি হয়েছে ঃ

- ইলিশের জীববিদ্যা;
- পপুলেশন প্যারামিটারসমূহ;
- খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস;
- ইলিশের প্রজনন;
- মজুদ ও Racial position;

প্রয়োজনীয় গবেষণা কাজ

ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য জলজ সম্পদ (renewable aqualic Resource) ইলিশের জীবনচক্র বেশ জটিল। বাসস্থান, জলজ পরিবেশসহ জলবায়ুগত উপাদান যথা : বৃষ্টিপাত, পানি প্রবাহ, চলাচল পথ ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের ওপর ইলিশ মাছের উৎপাদন নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য সৃষ্ট নানা কারণে উক্ত বিষয়সমূহ প্রতিনিয়ত প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবেশ ও বাসস্থানের পরিবর্তনের সাথে ইলিশের প্রাচুর্য এবং বায়োলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে এ সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা কাজ পরিচালনা করা আবশ্যক। অতি সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তরের ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের জি, ই, এফ, কম্পোন্যান্টের আওতায় নিম্নলিখিত গবেষণা কাজসমূহ পর্যায়ক্রমে পরিচালনার জন্য শনাক্ত করা হয়েছে। শনাক্তকৃত বিষয়সমূহের ওপর ফলপ্রসূ গবেষণা সম্পন্ন করা হলে তা ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কলাকৌশল নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর গবেষণা কাজ পরিচালনা করা আবশ্যক।

ইলিশের আবাসস্থল ও পরিবেশ বিষয়ক

- ইলিশের আবাস স্থলের পরিধি ও অঞ্চল;
- ইলিশের উৎপাদন ও পরিবেশ বিপর্যয়;
- ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ পথ;
- ইলিশ উৎপাদন ও পপুলেশনের ওপর দূষণ এবং পরিবেশের প্রভাব।

ইলিশের জীববিজ্ঞান এবং কৌলিতত্ত্বে

- চন্দনা ইলিশের আহরণ/উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ ও সম্ভাব্য প্রতিকার;
- ইলিশের চলাচল/মাইগ্রেশনের ধরণ, স্বাদু পানি ও উপকূলীয় এলাকায় ইলিশের অবস্থান; বিভিন্ন ধরনের আবাসস্থলে ইলিশের বয়স, বৃদ্ধির হার এবং পরিপক্বতা নিরূপণ;
- উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্রে ইলিশের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও পরিবীক্ষণ এবং সমুদ্রে ইলিশের নিরাপদ এলাকা উন্নয়ন;
- ইলিশ মাছের প্রজনন জীববিজ্ঞান, যেমন : পরিপক্বতার বয়স, ফেকাডিটি, লিঙ্গ পরিবর্তন এবং স্পনিং ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি নিরূপণ;
- আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশের খাপ খাওয়ানোর সম্ভাবনা ইত্যাদি।

পপুলেশন ডিনামিক্স এবং প্রাকৃতিক মজুদের পরিমাণ নিরূপণ

- ইলিশ মাছের বিভিন্ন পপুলেশন প্যারামিটার নির্ণয়;
- পরিমিত পরিমাণ ইলিশ আহরণে ফাঁস জালের নৈর্বাচনিকতা নির্ণয়।

ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

- ইলিশ উৎপাদনে অভয়াশ্রমের প্রভাব নিরূপণ;
- নির্দিষ্ট মৌসুমে জাটকা আহরণ না করার প্রভাব নিরূপণ।

আর্থ-সামাজিক

- বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জীবনযাত্রার ইলিশ মাছের অবদান;
- ইলিশ আহরণকারী গ্রামীণ মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর জলমহাল ব্যবস্থাপনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির (সমবায়, টেন্ডার, পদ্ধতি, নতুন জলমহাল নীতিমালা এবং সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবাধ প্রবেশাধিকার) প্রভাব নির্ণয় এবং টেকসই পদ্ধতির প্রচলন ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;

পরিবহন এবং মান নিয়ন্ত্রণ

- ইলিশ পরিবহনের পদ্ধতি উন্নতকরণ ও গুণগত মান বজায় রাখা;
- ইলিশ মাছ কৌটাজাতকরণ, শুঁটকি, ধূমায়িতকরণ এবং ইলিশের ডিম লবণজাতকরণ ইত্যাদি।

গবেষণা পরিচালন পরিকল্পনা

মৎস্য সম্পদের গবেষণা কাজে নিয়োজিত প্রধান প্রতিষ্ঠান বিএফআরআইকে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। কিছু কিছু বিষয়ে যেমন ঃ মৎস্যজাত পণ্য উন্নয়নের কাজে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের ফিসারিজ টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট, কক্সবাজারে অবস্থিত সামুদ্রিক মৎস্য এবং প্রযুক্তি কেন্দ্র ও অন্যান্য আগ্রহী বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা কর্তৃকও গবেষণা কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে।

গবেষণার কাজে অর্থের সংস্থান

বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনীতিতে ইলিশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাছ হিসাবে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। তাই মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দে কতিপয় গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা দরকার। কিছু কিছু প্রকল্পের জন্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও বিদেশী গবেষণাগারের সহায়তা পাওয়া প্রয়োজন যেমন– GEF, IDRC, NORAD, ACIAR ইত্যাদি সংস্থা অর্থ যোগানে কার্যকরী অবদান রাখতে পারে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জনবল উন্নয়ন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের চাঁদপুরে অবস্থিত নদী কেন্দ্র ইলিশ মাছের ওপর প্রধানত গবেষণা কাজ করে থাকে। এ কেন্দ্রের জনবলের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। বিশেষত হিলশা রিসার্চ টিম-এর সীমিত জনবল দিয়ে ইলিশ মাছের ওপর পরিপূর্ণ গবেষণা চালিয়ে যাওয়া খুবই দুষ্কর। তাই এক্ষেত্রে জনবল ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ইলিশ মাছ যেহেতু দেশের মৎস্য সম্পদ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, তাই এ সম্পদের উন্নয়নের স্বার্থে এর ওপর গবেষণার বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় জনবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ "হিলশা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের" গঠন করা যেতে পারে।

গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান

গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব মৎস্য অধিদপ্তরের। তাই গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে বি, এফ, আর, আই এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ও পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরও কার্যকর এবং সহযোগিতামূলক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ২৫ দিন : ০৫ মেয়াদকাল : ৬০ মিনিট

শিরোনাম : ইলিশ মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ, প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ও রপ্তানী সম্ভাবনা

লক্ষ্য : এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের লক্ষ্য হচ্ছে– ইলিশ মাছ পরিবহন এবং বাজারজাতকরণের বর্তমান পদ্ধতি, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সময় ইলিশ এবং বাজারজাতকরণের বর্তমান পদ্ধতি, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সময় ইলিশ মাছের গুণগত মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কৌশল, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এবং রপ্তানির সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা সাধারণ ভুক্তাদের নিকট ইলিশ মাছ পৌছাতে অবদান রাখতে পারে।

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ—

- ইলিশ মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণের বর্তমান পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইলিশ মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইলিশ মাছের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট যথা কৌটাজাতকরণ, লবণাক্ত ইলিশ ও লবণাক্ত ডিম প্রস্তুত, শুটকি ইলিশ প্রস্তুত করতে পারবেন।'

বিষয়সূচী	*আলোচ্য বিষয়*	*পদ্ধতি*	*সময়*
ভূমিকা	স্বাগতম পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন; বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ও উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু	- ইলিশ মাছের বর্তমান পরিবহন পদ্ধতি, পরিবহনের সময় ইলিশ মাছ প্যাকেজিং, বরফায়ন; - ইলিশ মাছ বাজারজাতকরণের নেটওয়ার্ক; - পরিবহন ও বাজারজাত করণের সময় গুণগত মান বজায় রাখার কৌশল; - ইলিশ মাছের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট যথা- কৌটাজাতকরণ, লবণাক্ত ইলিশ ও লবণাক্ত ডিম প্রস্তুত, শুটকি ইলিশ প্রস্তুত ইত্যাদি; - ইলিশ মাছ রপ্তানির পরিমাণ, রপ্তানিকৃত দেশ ও রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা।	আলোচনা প্রশ্ন-বিরতি-নাম ও ফ্লিপচার্ট	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	- মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা; - উদ্দেশ্য যাচাই এবং - পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান	প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, ডাস্টার, হ্যান্ডআউট।			

ইলিশ মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন মান নিয়ন্ত্রণ, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ও রপ্তানি সম্ভাবনা

ইলিশ মাছের বর্তমান পরিবহন পদ্ধতি

ইলিশ মাছ দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নদ-নদীর মোহনা এলাকা এবং সমুদ্র হতে ধরা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে আহরিত প্রায় ৭০% ভাগ ইলিশ মাছ সমুদ্রে ধরা পড়ে। সমুদ্র হতে কাঠের নির্মিত ফিসিং ট্রলার বা মেকানাইজড বোট দিয়ে ইলিশ মাছ ধরা হয়ে থাকে। সাধারণত ১২-১৫ জনের জেলেদল ১০-১৫ দিনের খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় জল এবং বরফ নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য যায়। অমাবস্যা বা পূর্ণিমাকে সামনে রেখে জেলেদল সমুদ্রে যাত্রা করে থাকে। ধৃত ইলিশ মাছ সংরক্ষণের জন্য ফিসিং ট্রলারে ইনসুলেটেড স্টোর থাকে। জেলেরা ধৃত মাছ বরফ দিয়ে ঐ স্টোরে সংরক্ষণ করে। অতঃপর মাছ ধরা শেষ হলে বা তাদের খাদ্য ও পানীয় জল শেষ হলে মাছ বিক্রির জন্য তীরে ফিরে আসে। অনেক সময় সমুদ্র হতে বহনকারী নৌকা বা ক্যারিয়ার বোটে করেও মাছ তীরের আড়তদার পর্যন্ত বহন করা হয়। তীরে আসার পর জেলেরা সাধারণত মাছ পাইকারি বাজারের আড়তদারের মাধ্যমে বিক্রি করে। আড়তদারের নিকট হতে স্থানীয় পাইকার, খুচরা বিক্রেতাগণ মাছ ক্রয় করে রিকশা, ভ্যান অথবা সরাসরি নিজেরা বহন করে মাছ স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে। অন্যান্য পাইকার এবং রপ্তানীকারকগণ আড়ত হতে মাছ ক্রয়পূর্বক বরফ দিয়ে প্রাপ্যতা অনুযায়ী সুবিধামতো পরিবহন যথা– লঞ্চ, মেকানাইজড বোট, ট্রাক ও ট্রেন যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে থাকে।

অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে ধৃত মাছ অনেক সময় জেলেরা সরাসরি নিজেরা খুচরা বাজারে বা পাইকারি বাজারে আড়তদারের নিকট বিক্রয় করে। আবার কখনও কখনও নিজস্ব মহাজনের ক্যারিয়ার বোটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে থাকে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের জেলেরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাছ ধরার পর মাছ সরাসরি খুচরা বাজারে অথবা পাইকারি বাজারে আড়তদারের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকে। মাছ ধরার স্থান হতে পাইকারি বাজার ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ইলিশ মাছ পরিবহনের পদ্ধতি নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হলো :

ইলিশ মাছের প্রধান অবতরণ কেন্দ্র

বাংলাদেশে ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান অবতরণ কেন্দ্রের নাম নিচে দেয়া হলো :
১) কক্সবাজার, ২) চট্টগ্রাম, ৩) টেকনাফ, ৪) কুতুবদিয়া, ৫) হাতিয়া, ৬) সন্দ্বীপ, ৭) ভোলা, ৮) পটুয়াখালী, ১০) খেপুপাড়া, ১১) মহিপুর, ১২) কুয়াকাটা, ১৩) পাথরঘাটা, ১৪) খুলনা, ১৫) চাঁদপুর, ১৬) ঢাকা, ১৭) গোয়ালন্দ।

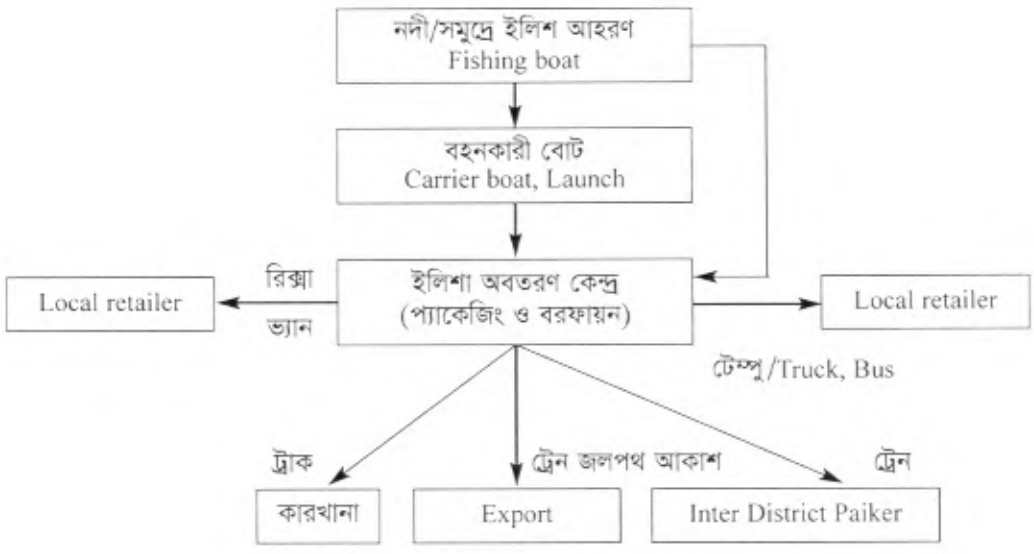

চিত্র-২৪.১ : ইলিশ মাছের বর্তমান পরিবহন পদ্ধতি

বাজারজাতকরণের পদ্ধতি ও নেটওয়ার্ক

ইলিশ মাছ বিভিন্ন স্থানে হতে ধরার পর ওপরে আলোচিত পদ্ধতিতে দেশের বিভিন্ন বাজারে পরিবহন করা হয়। ইলিশ মাছের বিভিন্ন বাজারকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা ঃ

- প্রাথমিক বাজার
- মাধ্যমিক বাজার
- উচ্চ মাধ্যমিক বাজার
- সর্বশেষ বাজার
- বিদেশের রপ্তানি বাজার

প্রাথমিক বাজার (Primary Market)

ইহা সাধারণত নদী এবং উপকূলীয় এলাকায় মাছ ঘাট অথবা অবতরণ কেন্দ্রে হয়। জেলেরা মাছ ধরার পরে অবতরণ কেন্দ্রে আসে মাছ বিক্রির জন্য। আড়তদার অথবা মহাজনরা নিলামের মাধ্যমে স্থানীয় পাইকারের নিকট মাছ বিক্রি করে। অনেক সময় আড়তদার অথবা মহাজনকে না জানিয়ে জেলেরা আংশিক ধৃত মাছ নদীতে ভাসমান পাইকার অথবা বেপারির নিকট বিক্রি করেও থাকে।

মাধ্যমিক বাজার

প্রাথমিক বাজার হতে ক্রয়কৃত ইলিশ মাছ আন্তঃজেলা পাইকার অথবা বেপারিগণ দেশের মাধ্যমিক বাজারে অপেক্ষাকৃত বড় আড়তদার অথবা কমিশন এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে।

উচ্চ মাধ্যমিক বাজার

খুচরা বিক্রেতাগণ মাধ্যমিক বাজার হতে ক্রয়কৃত ইলিশ মাছ স্থানীয় বাজারে ভোক্তার নিকট বিক্রি করে। এখান হতে কিছু মাছ পাইকারগণ ক্রয় করে পুনরায় দেশের অন্যান্য বাজারে প্রেরণ করে এবং কিছু কিছু মাছ বিদেশেও রপ্তানি করে।

সর্বশেষ বাজার

পাইকাররা উচ্চ মাধ্যমিক বাজার হতে মাছ ক্রয় করে খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রি করে। খুচরা বিক্রেতা আবার দুই ধরনের হয়। একটি হলো শহর অঞ্চলের এবং অন্যটি উপশহর অথবা গ্রাম বাজার অঞ্চল। এইভাবে ইলিশ মাছ সর্বশেষে ভোক্তার নিকট পৌঁছে।

বিদেশের রপ্তানি বাজার

বিদেশে রপ্তানির জন্য সাধারণত প্রাথমিক বাজার বা অবতরণ ক্ষেত্র হতে পাইকার, আড়তদারগণ মাছ বাছাই করে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাছ ক্রয় করে। অতঃপর মাছ বরফ দিয়ে দেশের প্রচলিত পদ্ধতিতে প্যাকিং করে রপ্তানির জন্য সমুদ্র বন্দর, আন্তঃদেশীয় সীমান্ত শহরের চেক পয়েন্ট (স্থলবন্দর), বিমানবন্দর, রেল ও ট্রাকযোগে প্রেরণ করে থাকে। রপ্তানির জন্য কিছু মাছ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বাজার হতেও সংগ্রহ করা হয়। নিম্নের রেখাচিত্র ২৪:২ এ ইলিশ মাছ বাজারজাতকরণের নেটওয়ার্ক দেয়া হলো :

পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সময় ইলিশ মাছে বরফ প্রয়োগ ও প্যাকেজিং

ইলিশ মাছ ধরার পর প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও পাইকারি বাজারে আনতে বেশ সময় লেগে যায়। তাই উক্ত সময়ে মাছ পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বরফ প্রয়োগ করে মাছের পচনরোধ করা সম্ভব। বরফ ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মাছের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা। মাছের দেহের বিপন্মুক্ত তাপমাত্রা হলো ০-৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। উক্ত তাপমাত্রায় মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে মাছের গুণগত মান সঠিক থাকে। সাধারণত নিম্নের অনুপাতে বরফগুঁড়া Stake Ice মাছে প্রয়োগ করা হলে মাছের গুণগত মান প্রায় অক্ষুণ্ন থাকে।

ক্রমিক নং	মাছ	বরফ গুঁড়া
১।	২ঃ১	
২।	১ঃ১	
৩।	২ঃ৩	

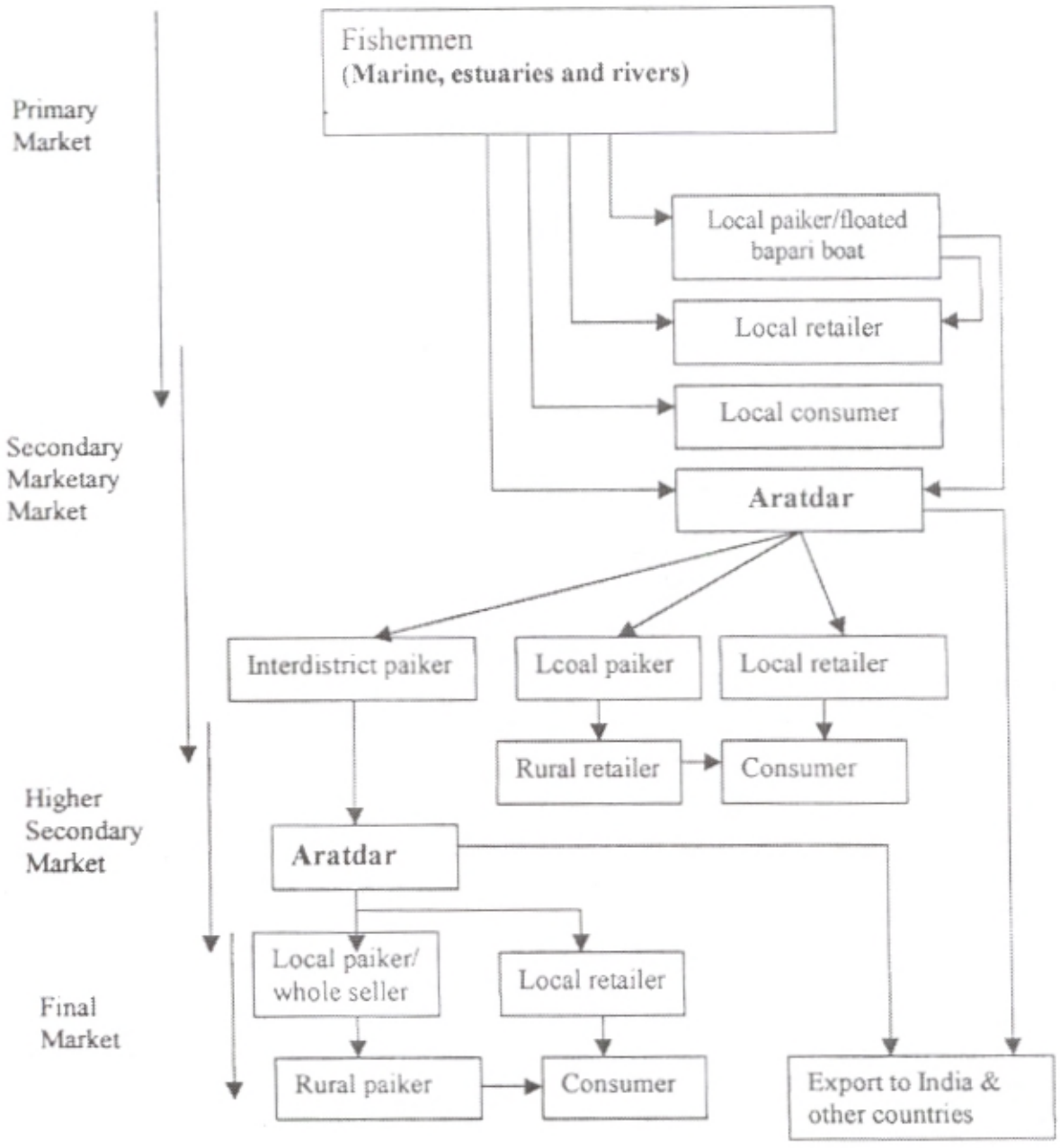

Fig. 24.2 : Marketing channel of hilsa fish in Bangladesh

*** বরফকরণ পদ্ধতি**

১। নিচে মাছ এবং উপরে বরফ

২। ওপরে ও নিচে বরফ মাঝখানে মাছ

৩। নিচে বরফ, তার ওপরে মাছ, তারপর বরফ, আবার মাছ এবং পরে বরফ।

কিন্তু আমাদের দেশে উপরোক্ত অনুপাতে মাছে বরফ প্রয়োগ করা হয় না। এ বিষয়ে জেলেসহ সকল পাইকার ও আড়তদারগণকে সচেতন করা যেতে পারে।

প্যাকেজিং উপকরণ

ইলিশ মাছ প্যাকিং করতে সাধারণত নিম্নলিখিত উপকরণ ব্যবহৃত হয়

ক. বরফ

খ. কাঠের বাক্স

গ. হুগলা/চট

উপরোক্ত উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ তাপ নিরোধক নয়। উন্নত দেশে মাছ পরিবহনের জন্য তাপ নিরোধক প্লাস্টিক বাক্স ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশেও তাপ নিরোধক প্লাস্টিক বাক্সের প্রচলন করা যেতে পারে।

পরিবহন ও বাজাজাতকরণের সময় গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ রাখার কৌশল

গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যাবলী-

- গুণগত মান সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে বাজারে উচ্চমূল্যে পাওয়া যাবে। ফলে সংশ্লিষ্ট সকলেই লাভবান হবেন;
- রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারী আর্থিক লাভ সমুন্নত রাখতে;
- জাতীয় আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের স্বার্থে;
- আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের টিকে থাকার স্বার্থে।

গুণগত মান সংরক্ষণের কৌশল

কাজটি করতে গিয়ে কোন পর্যায়ে/স্তরে ইলিশ মাছের গুণগত মান বিনষ্ট হয় তা আমাদের জানা দরকার এবং ঐ সকল স্তরে কার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, কার কি দায়িত্ব তাও জানা দরকার। একইভাবে বিভিন্ন স্তরে কি কি অবহেলা ও অসাবধানতার কারণে ইলিশ মাছের গুণগত মান বিনষ্ট হয় এবং তার জন্য কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা জেনে সে অনুযায়ী সকলকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইলিশ মাছের গুণগত মান বিনষ্টের স্তর, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় করণীয় নিম্নের ফ্লোচার্টের (২৪.৩) মাধ্যমে দেখানো হলো।

ইলিশের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে সমস্যা

- ধৃত মাছ নৌকা ও জলযানে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয় না;
- কাঠের বাক্স, বাঁশের ঝুড়িতে ইলিশ পরিবহন বিজ্ঞানসম্মত নয়;
- দীর্ঘ সময় মাছ খোলা অবস্থায় রাখা হয়;
- বরফ প্রয়োগে সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না;
- গাদাগাদিভাবে মাছ রাখা ও বরফ মেশানোর বিলম্ব;
- অস্বাস্থ্যকরভাবে মাছ হ্যান্ডলিং করা;
- লবণ মেশানোর জন্য সাধারণত নিম্নমানের মাছ বাছাই করা হয়;
- ভেজাল ও সস্তা লবণ ব্যবহার, মাছ ও লবণের ত্রুটিপূর্ণ অনুপাত এবং বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব।

উত্তরণের উপায়

(১) সরাসরি সূর্যরশ্মি উষ্ণ স্থান ও তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি থেকে সরিয়ে রেখে তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক মাত্রায় বরফ প্রয়োগ করতে হবে (সঠিক মাত্রায় বরফ প্রয়োগে ১৫-১৮ দিন মাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে)।

(২) পরিবহনের জন্য বাক্স/ ঝুড়িতে বরফের অনুপাত এমন হওয়া উচিত যাতে তা সব সময় শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কাছাকাছি থাকে;

(৩) হিমায়নের পূর্বে মাছে একবার পচন ধরলে তা হিমায়ন, হিমায়িত গুদামে সংরক্ষণ ও বরফ গলানোর প্রতিটি পর্যায়েই থেকে যায়। এ জন্য হিমায়িত মাছের মান নিয়ন্ত্রণের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হিমায়ন প্রক্রিয়ার জন্য নিখুঁতভাবে মাছ প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করা। হিমায়ন (Freezing) কালে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে শতর্কতা অবলম্বন করা উচিত :

(ক) তাপমাত্রা বাড়ার আগেই মাছ হিমায়নের ব্যবস্থা করা;

(খ) হিমায়ন যাতে মন্থর ও অসম্পূর্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা;

(গ) হিমায়িত মাছ প্যাকিং ও কোল্ড স্টোরেজে স্থানান্তর কাজে বিলম্ব পরিহার করা এবং

(ঘ) কোল্ড স্টোরেজে তাপমাত্রা যাতে বৃদ্ধি না পায় বা ওঠানামা না করে তার ব্যবস্থা করা।

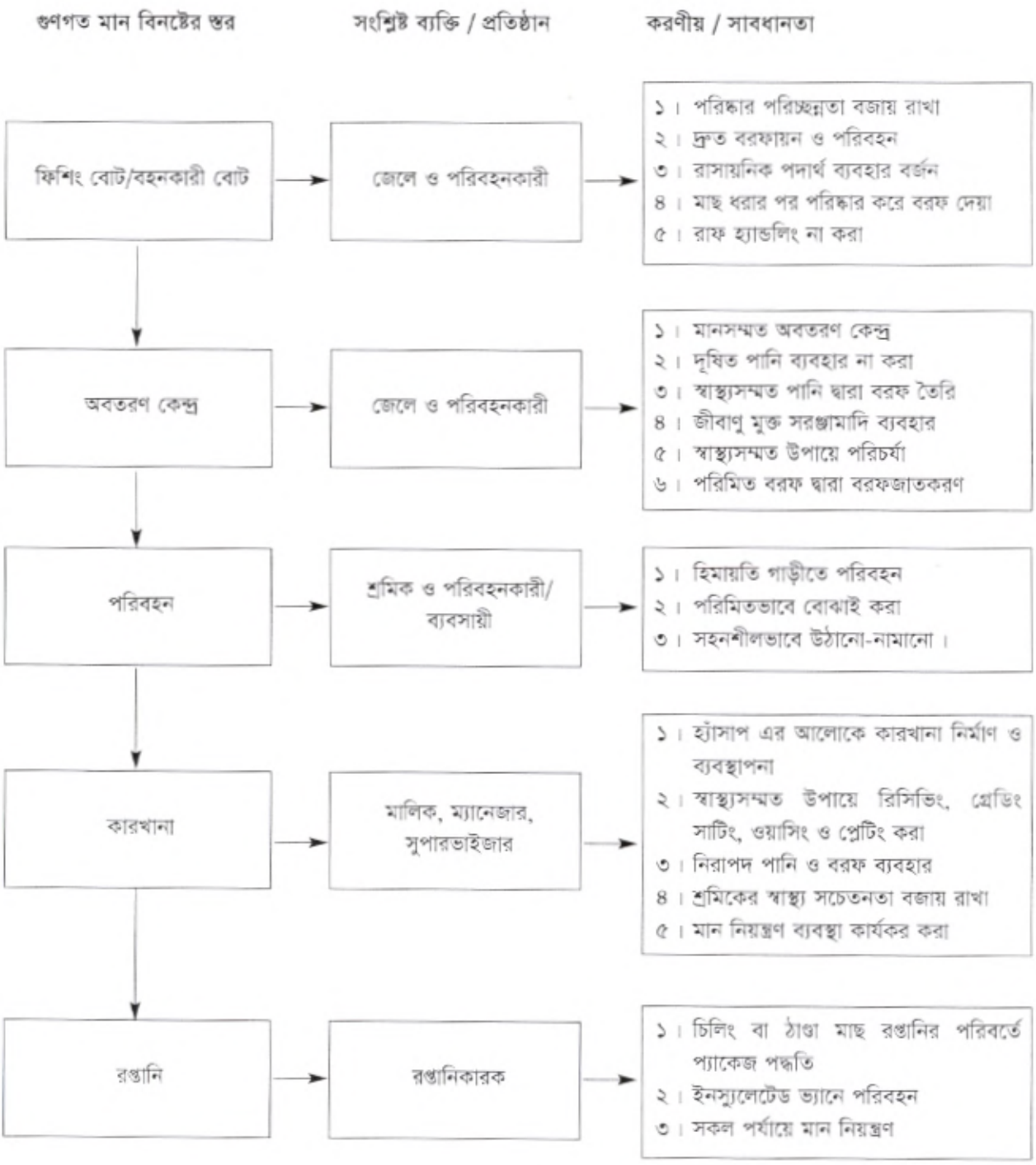

ফোচার্ট ২৪.৩ ইলিশ মাছের গুণগত মান বিনষ্টের স্তর, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং করণীয় কাজ/ সাবধানতা

উপরোক্ত ফ্লোচার্ট থেকে স্পষ্টত প্রতীমান হয় যে, আহরণ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পর্যন্ত এমনকি রান্নাঘর পর্যন্ত বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্য সম্মত খাবার হিসাবে ইলিশের গ্রহণ যোগ্যতা বিনষ্ট অথবা জীবাণু (bacteria) দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইলিশ মাছ নিম্নের পদ্ধতি বা ফ্লোচার্ট (২৪.৪) অনুযায়ী হিমায়তি করা হলে গুণগত মান অক্ষুণ্ন থাকবে।

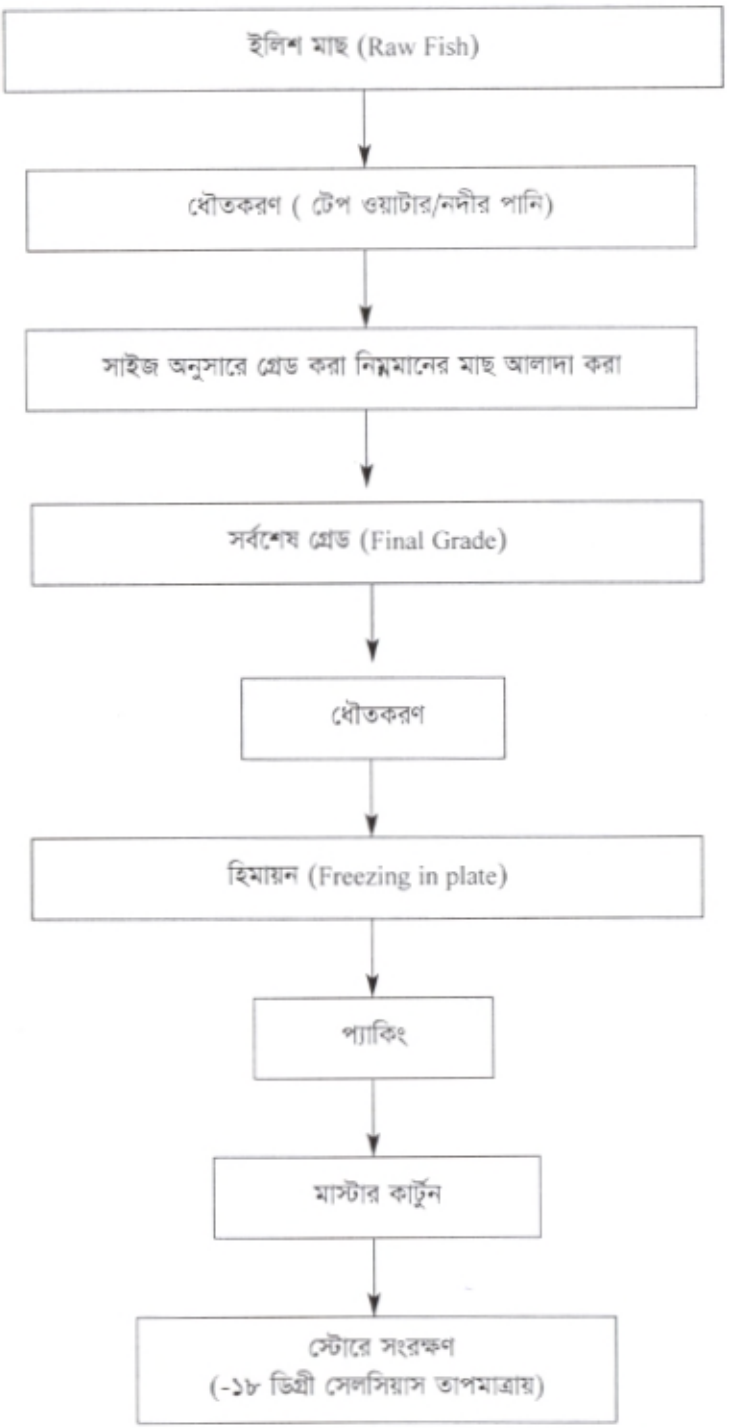

ফ্লোচার্ট-২৪.৪ : ইলিশ মাছের হিমায়ন পদ্ধতি (Freezing)

ইলিশ মাছের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট

কৌটাজাতকরণ

এ মাছকে কৌটাজাত বা ক্যানিংয়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণ বা সংরক্ষণের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্রে ইলিশ কৌটাজাতকরণ প্রক্রিয়া সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। লবণ ও সয়াবিন তেলের মিশ্রণে ১২১ সেঃ তাপমাত্রায় ১৫ পাউন্ড চাপে ৫৫ মিনিটে কৌটাজাতকৃত ইলিশ মাছ ১-১.৫ বছর পর্যন্ত ভাল অবস্থায় সংরক্ষণ করা গেছে। দেশে বাণিজ্যিকভাবে ইলিশ মাছ কৌটাজাত করা হলে রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনা আছে।

লবণাক্ত ইলিশ ও লবণাক্ত ডিম প্রস্তুত (Salting) ঃ এটা দুই ভাবে করা যায় যথা :

(ক) ভেজা লবণ (Brine water) ১৫-২০% লবণের দ্রবণ ভাল ফল দেয়।

(খ) শুষ্ক লবণ (Dry Salt) ঃ লবণ ও মাছের অনুপাত ১ঃ৩ থেকে ১ঃ১০ দিতে হয়।

শুঁটকি ইলিশ প্রস্তুত

ইলিশ মাছের দেহে চর্বির পরিমাণ বেশি বিধায় ভাল শুঁটকি প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। তবে উপকূলীয় কোন কোন এলাকায় অতি সামান্য পরিমাণে ইলিশ মাছের শুঁটকি প্রস্তুত করা হয়। কোথাও আবার লবণের হালকা প্রলেপ দিয়ে ও রৌদ্রে শুকানো হয়। তবে এ জাতীয় পণ্য দীর্ঘ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত নয়। তাজা বা টাটকা মাছ ব্যবহার, লবণ ও মাছের সঠিক অনুপাত বজায় রাখা এবং মাছের আকার ও ঘনত্বের আলোকে এর সঙ্গতি বিধান, মাছ কাটা ও নাড়িভুঁড়ি বের করার সময় সতর্কতা অবলম্বন, পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা, লবণ মিশ্রণের পর সঠিকভাবে শুকানো প্রভৃতি অনুসরণ করা হলে লবণাক্ত মাছ দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা সম্ভব। লবণাক্ত মাছ কত দিন ভাল থাকবে তা মূলত নির্ভর করে মাছের আর্দ্রতা, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও প্যাকিংয়ের ওপর।

ইলিশ মাছ রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা

ইলিশ মাছ সাধারণত ঠাণ্ডা অবস্থায় (Chill) রপ্তানি করা হয় এবং ফ্রোজেন মাছ রপ্তানির পরিমাণের সাথে একত্রে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবছর গড়ে ৮,০০০ হতে ১০,০০০ টন ফ্রোজেন ফিস রপ্তানি করা হয়ে থাকে। উক্ত ফ্রোজেন ফিস এর শতকরা ৮-১০ ভাগ ইলিশ মাছ। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ হতে ইলিশ মাছ রপ্তানির পরিমাণ ৮০০ হতে ১০০০ টন। এ ছাড়া ভারতে প্রতি বছর ২,০০০-৫,০০০ টন পর্যন্ত ইলিশ রপ্তানি হয়ে থাকে। ভারতে যে সমস্ত মাছ রপ্তানি করা হয় তা সাধারণত দেশের সীমান্তের স্থলবন্দর যথা বেনাপোল, হিলি, চিরির বন্দর, আখাউড়া, এবং সিলেট, কুমিল্লা ও খুলনার সীমান্ত পথ দিয়ে ট্রাক ও ট্রেনযোগে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে ভারত ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের কয়েকটি দেশ, অস্ট্রেলিয়া এবং মালয়েশিয়াতে ইলিশ মাছ রপ্তানি করা হয়।

উল্লেখিত দেশসমূহে ইলিশ মাছ সমুদ্রপথ ও বিমানপথে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ হতে সকল মাছ বরফ দিয়ে বা (Chilled conditon) এ এবং খুবই অল্প পরিমাণ মাছ ফ্রোজেন বা ব্লক করে পাঠানো হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১৯ হাজার মেঃ টন জাটকা ধরা হচ্ছে। যদি উক্ত জটিকা সংরক্ষণ করা যায় তবে অতিরিক্ত প্রায় ১.৫-২.০ লক্ষ টন ইলিশ মাছ প্রতিবছর উৎপাদন করা সম্ভব। উক্ত অতিরিক্ত ইলিশ মাছ বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ২৬ | দিন : ০৫ | মেয়াদকাল :ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম : **আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশ মাছ খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা ও চাষের সম্ভাবনা**

লক্ষ্য : এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের ইলিশ মাছকে আবদ্ধ জলাশয়ে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা এবং চাষের সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা এ বিষয়ে বাস্তবসম্মত জ্ঞান লাভ করতে পারে।

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশ মাছ খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে;
- আবদ্ধ জলাশয়ে খাপ খাওয়ানো এবং পুকুরে ইলিশ চাষ, পরিপক্বতা ইত্যাদি বিষয়ে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচী	*আলোচ্য বিষয়*	*পদ্ধতি*	*সময়*
ভূমিকা	স্বাগতম পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন; বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ও উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু	আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশ মাছ খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা - প্রাকৃতিক জলাশয়ে ইলিশ মাছের বৃদ্ধির হার; - আবদ্ধ জলাশয়ে বাণিজ্যিক প্রজাতির (রুই, কাতলা ইত্যাদি) মাছের বৃদ্ধির হার; - পুকুরে ইলিশ চাষের ফলাফল; - পুকুরে ইলিশ চাষের সমস্যা; - আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশ মাছ খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা।	আলোচনা প্রশ্ন-বিরতি-নাম ও ফ্লিপচার্ট	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	- মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা; - উদ্দেশ্য যাচাই এবং - পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান	প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ডাস্টার, হ্যান্ডআউট।			

আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশ মাছের খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা ও চাষের সম্ভাবনা

ভূমিকা

আমরা জানি ইলিশ গভীর জলের মাছ। এরা সাধারণত সমুদ্র হতে বিভিন্ন নদ-নদী এবং নদ-নদীর মোহনা খাদ্যের সন্ধানে এবং প্রজননের জন্য অভিপ্রয়াণ করে থাকে। ইলিশ আমাদের দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় মাছ। তাই অনেকে শখের বসে ইলিশ মাছ আবদ্ধ জলাশয় বা পুকুরে চাষের আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। তাই বিভিন্ন আগ্রহী চাষিসহ বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ দিনের কৌতূহল ইলিশ মাছকে আদৌ আবদ্ধ জলাশয়ে খাপ খাওয়ানো সম্ভব কিনা। উক্ত কৌতূহল ও বির্তক নিরসনের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নদী কেন্দ্র চাঁদপুর হতে ইলিশ মাছ আবদ্ধ জলাশয়ে খাপ খাওয়ানোসহ পুকুরে চাষের সম্ভাবনা পরীক্ষা করা হয় এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ের ইলিশ মাছের বৃদ্ধির সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা হতে ইলিশ মাছকে আবদ্ধ জলাশয়ে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা এবং পুকুরে চাষের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা পেতে পারি।

প্রাকৃতিক জলাশয়ে ইলিশ মাছের বৃদ্ধির হার

মাছের দৈর্ঘ্য ঘটন সংখ্যা বিশ্লেষণ করে প্রাকৃতিক জলাশয়ে বৃদ্ধির হার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উপরোক্ত পদ্ধতিতে ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক জলাশয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ ১২-১৫ মাসে প্রায় ৩০-৩১ সেঃমিঃ এবং উক্ত দৈর্ঘ্য তাদের গড় ওজন প্রায় ৪০০-৫০০গ্রাম পাওয়া গিয়েছে। নিম্নের চিত্র (২৫.১) হতে প্রাকৃতিক জলাশয়ে ইলিশ মাছের বৃদ্ধির একটি ধারণা পাওয়া যায়।

উপরের চিত্র হতে দেখা যায় ইলিশ মাছের বৃদ্ধির হার প্রথম ২ বছর বেশ দ্রুত প্রকৃতির এবং পরবর্তী পর্যায়ে বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্য পর্যায়ে উপনীত হয়। তবে প্রাকৃতিক জলাশয়েও ইলিশ মাছের হার আমাদের দেশের রুই কাতলা মাছের চেয়ে অনেক কম। রুই-কাতলা জাতীয় মাছের ২-৩ আকারের পোনা ৭০০০-৮০০০ প্রতি হেক্টরে মজুদ করা হলে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১.০ কেজি ওজনের পাওয়া যায়।

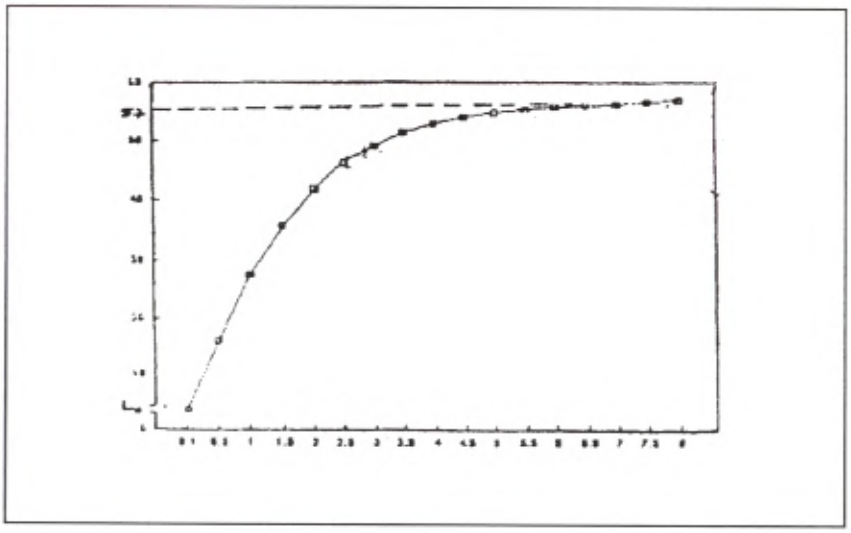

পুকুরে ইলিশ চাষের ফলাফল

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নদীকেন্দ্র চাঁদপুরে বিগত ১৯৮৮ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে নদী হতে জাটকা সংগ্রহ করে পুকুরে চাষ করা হয়। উপরোক্ত পরীক্ষামূলক চাষের জন্য প্রথমে পুকুর শুকানো হয়। পুকুর শুকানোর ১০ দিন পরে ১০০ কেজি/ হেক্টর হারে চুন প্রয়োগ করা হয়। চুন প্রয়োগের ১০ দিন পরে ১নং পুকুরে ৩০কেজি/হেক্টর ১০ দিন হারে ইউরিয়া সার এবং ২নং পুকুরে ৩০০০ কেজি/হেক্টর ১০দিন হারে গোবর প্রয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত পুকুর হতে নিয়মিতভাবে পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী নির্ণয় এবং প্লাকটনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে (১নং পরীক্ষামূলক চাষ) উক্ত চাষের ফলাফল নিম্নের সারণি ২৫.১ এ দেয়া হলো :

সারণি ২৫.১ : পুকুরে ইলিশ চাষের ফলাফল ১৯৮৮*

চাষের মেয়াদ	পুকুর নং	পোনার সংখ্যা হেঃ	মজুদকালীন সময়ের গড় দৈর্ঘ্য (সে:মি:)	মজুদকালীন সময়ের গড় ওজন (গ্রাঃ)	আহরণ কালীন গড় দৈর্ঘ্য (সে:মি:)	আহরণ কালীন গড় ওজন (গ্রাঃ)	বৃদ্ধির হার (%)	
							দৈর্ঘ্য	ওজন
১৯৮৮	১	২৫,০০০	৫.৩	১.৫	২৯.২	৩০০.০	৪৫০.৯	১৯,৯০০
৩৬৫ দিন	২	২৫,০০০	৫.৩	১.৫	২২.৬	১২৫.০	৩২৬.৪	৮,২৩৩

সূত্র : জি, মাওলা; এম, এ, মজিদ; এম, জে, রহমান; এম, এ, রহমান এবং ই, মাহমুদ -১৯৯২

দ্বিতীয় পরীক্ষায় (১৯৯৯-২০০০সালে) শুধুমাত্র পুকুর প্রস্তুতির সময় চুন ও গোবর ১ কেজি/ ডেসিমাল হারে প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে পুকুরের আগাছা পরিষ্কার ছাড়া কোনরূপ সার বা গোবর প্রয়োগ করা হয়নি। উক্ত চাষের ফলাফল নিম্নে সারণি ২৫.২ এ দেয়া হলো :

সারণি ২৫.২ : পুকুরে ইলিশ চাষের ফলাফল (১৯৯৯-২০০০)

Culture period	Stocking2				Harvesting				Calculated wt. of same size Hilsha in nature (g)
500 days	Stocking/ ha	Total Nos./ Pond	Av. Length (cm)	Weight (g)	Nos./ Pond	Survival (%)	Length (cm)	Weight (g)	
	4000	480	4.70	0.93	50	10.42	30.75	316.2	428.13

উপরের দু'টি পরীক্ষামূলক চাষ হতে দেয়া যায় যে, পুকুরে ইলিশ মাছের বৃদ্ধি এবং বাঁচার হার (Survival) অত্যন্ত কম এবং উৎপাদনও কম। পুকুরে ইলিশ মাছ স্বল্প পরিমাণ পরিপক্বতা লাভ করলেও প্রজনন উপযোগী পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় পরিপক্বতা লাভ করে না। এ ছাড়া পুকুরে ইলিশ চাষে বেশ কিছু সমস্যাও দেখা দেয়।

পুকুরে ইলিশ চাষে সমস্যা

পুকুরে ইলিশ চাষে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা দেয়। যথা :

১) পোনা প্রাপ্তি ও পরিবহন

পুকুরে ইলিশ চাষের জন্য প্রাকৃতিক উৎসের পোনার ওপর নির্ভর করতে হয়। জাটকা মৌসুমে পর্যপ্ত পরিমাণে পোনা ইলিশ পাওয়া গেলেও পোনা ধরার স্থান হতে পুকুর পর্যন্ত পরিবহনের সময় ব্যাপক হারে মারা যায়। পলিথিন ব্যাগ এবং প্লাস্টিকের অক্সিজেনসহ

চৌবাচ্চা ইত্যাদিতে বাতাস প্রয়োগের (Agitation) মাধ্যমে পোনা পরিবহনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোন পদ্ধতিতেই পোনা বাঁচার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি।

২) নমুনায়ন ও পরিচর্যা

পুকুরে চাষকৃত ইলিশের নমুনায়ন (Sampling) করে তাদের বৃদ্ধির হার পর্যবেক্ষণ করা প্রায় অসম্ভব। নমুনায়ন করার সময় অনেক মাছ মারা যায়।

আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশ মাছ খাওয়ানোর (Adaptation) প্রয়োজনীয়তা

প্রকৃতির তুলনায় পুকুরে বা আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশ মাছের বৃদ্ধির হার অনেক কম, মাত্র ৫০-৬০%। চাঁদপুরে পুকুরে চাষ করে ৫০০ দিনে ৩১৬.০ গ্রাম পাওয়া গিয়েছে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে পুকুরে বা আবদ্ধ জলাশয়ে বানিজ্যিকভাবে ইলিশ মাছ চাষ করা লাভজনক হবে না। তবে ভবিষ্যতে আমাদের দেশে সেচ , বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজের জন্য কয়েকটি বড় নদী যেমন– পদ্মা, গড়াই ইত্যাদিতে বাঁধ দেয়া বা ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। উক্ত নদীসমূহে বাঁধ বা ব্যারেজ নির্মাণ করা হলে বাঁধের উপরের অংশে ইলিশ মাছ অভিপ্রয়াণ করতে পারবে না এবং দেশে ইলিশের উৎপাদন হ্রাস পাবে। যেমন : পদ্মা নদীর পাকশী সেতু থেকে ৬০ কিঃমিঃ ভাটিতে পাংশা থানার হাবাসপুর ঘাট এবং পাবনার সাতবাড়িয়া ঘাট এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। পদ্মা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণ করা হলে ইলিশ মাছের গতিপথ বাধাগ্রস্ত হবে এবং পদ্মা নদীর বিস্তীর্ণ করা হলে বাঁধের উপরের অংশে ইলিশ সংরক্ষণের জন্য আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশের মাছের গতিপথ বাধাগ্রস্ত হবে এবং পদ্মা নদীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল মিঠা পানির বদ্ধ জলাশয়ে পরিবর্তিত হবে। উক্ত ব্যারেজ নির্মাণের জন্য আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশের খাপ খাওয়ানের প্রয়োজন হতে পারে। এ ছাড়া আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশ মাছের পরিপক্বতা লাভ, কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন ইত্যাদি গবেষণা কাজের জন্য ও পরীক্ষামূলকভাবে পুকুরে ইলিশ চাষ করা যেতে পারে।

উপসংহার

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ধারণা করা যায় যে, বাণিজ্যিকভাবে পুকুরে ইলিশ মাছ চাষ লাভজনক হবে না। তবে কোন স্থানের পপুলেশন বা স্টক হারিয়ে গেলে উক্ত স্টক পুনরুদ্ধারের জন্য আবদ্ধ জলাশয়ে ইলিশের পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ২৭ | দিন : ০৫ | মেয়াদকাল : ৬০ মিনিট

শিরোনাম : ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক এবং আঞ্চলিক উদ্যোগ ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র ও কৌশল

লক্ষ্য : এ অধিবেশনে প্রার্থীদের ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা, সহযোগিতার ক্ষেত্র ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা উপরোক্ত বিষয়ে বাস্তবসম্মত জ্ঞান লাভ করতে পারে।

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ—

- ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার প্রয়োজন কেন এ বিষয়ে বলতে পারবেন;
- আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার জন্য কোন কোন দপ্তর/ অধিদপ্তরকে সংযুক্ত করা আবশ্যক এ বিষয়ে বলতে পারবেন;
- সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির জন্য মৎস্য অধিদপ্তর, গবেষণা ইনিস্টিটিউটসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা এবং কৌশল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র ও কৌশল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচী	*আলোচ্য বিষয়*	*পদ্ধতি*	*সময়*
ভূমিকা	স্বাগতম পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন; বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ও উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু	- আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক এবং আঞ্চলিক উদ্যোগ ও সহযোগিতা কি? - বাংলাদেশের আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার প্রয়োজন কেন? - সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ ও ধরন; - ইলিশ মাছের আবাসস্থল সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার; - জলজ পরিবেশ দূষণ রোধ; - আইন প্রয়োগ; - ইলিশ জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন; - গণশিক্ষা কর্মসূচীর বিস্তার ও সচেতনতা সৃষ্টি; - গবেষণার ফলাফল, আদান প্রদান ও তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি; - সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান; - আঞ্চলিক উদ্যোগের প্রয়োজন কেন? - ইলিশ মাছের একক স্টক; - সামুদ্রিক আহরণ নিয়ন্ত্রয়ণ ও ব্যবস্থাপনা; - নো-ফিসিং জোন ডেভেলপমেন্ট, প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা; - যৌথ গবেষণা ও তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি; - জলজ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ; - আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি; - আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাব্য দেশ; - আঞ্চলিক সহযোগিতার কৌশল;	বক্তৃতা আলোচনা, ফ্লিপচার্ট	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	- মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা, - উদ্দেশ্য যাচাই এবং - পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান।	প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৬ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, ডাস্টার, হ্যান্ডআউট।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক এবং আঞ্চলিক উদ্যোগ ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা, সহযোগিতার ক্ষেত্র ও কৌশল

আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক এবং আঞ্চলিক উদ্যোগ ও সহযোগিতা কী?

আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বলতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের জনবল, কর্মদক্ষতা বা সুচিন্তিত মতামত এর পরস্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময় ও ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা বা পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা বোঝায়।

আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা কেন প্রয়োজন?

বিশাল ব্যাপ্তিসম্পন্ন বা বড় কোন কাজ একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করতে গেলে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় যা বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেলে সহজে সম্পন্ন করা যায়। অপরদিকে কিছু কিছু কাজ একাধিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত। ঐ সকল কাজ একক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নির্বাহ করা সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষাপটে, ঐ সকল কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান একযোগে বা পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

ইলিশ মাছের ব্যাপ্তি অনেক বড়। বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমার এই তিনটি দেশ প্রধানত ইলিশ মাছ আহরণ করে থাকে। তাই ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির তথা ইলিশ মাছের আবাসস্থল, প্রজনন ক্ষেত্র, চারণক্ষেত্র ইত্যাদি রক্ষা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/জনসমষ্টিকে প্রয়োজন্য ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে জড়িত করা যায়। মাছ আহরণ, মাছ ব্যবসা, পরিবেশ উন্নয়ন, নদ-নদী ব্যবস্থাপনা কাজে জড়িত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আমরা এক্ষেত্রে পেতে পারি।

সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

- জাটকা, ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ নির্বিচারে নিধন রোধ করা ও আইন প্রয়োগ করা;
- মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন এবং অবক্ষয় রোধ করা;
- খাল, বিল ও নদীসহ অন্যান্য জলাশয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবক্ষয় রোধে ব্যবস্থা নেয়া;
- ইলিশ মাছের উন্নয়নে সামাজিক সচেনতা বৃদ্ধি ও জনমত সৃষ্টি করা;
- রাজনৈতিক ঐকমত্য সৃষ্টি করা;
- ইলিশ আহরণ, সংরক্ষণ, রপ্তানি ও অন্যান্য ব্যবসায়িক সুযোগ-সবিধা সৃষ্টি ও সুষম করা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ত্রাণ, শিক্ষা এবং কর্ম সংস্থানমূলক কাজ সমন্বয় করা।

সহযোগিতার সময়ানুপাতিক ধরন

- তাৎক্ষণিক ও নিবিড় সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি;
- মধ্য মেয়াদী বাস্তব সুযোগ সৃষ্টি এবং;
- দীর্ঘমেয়াদী ও পরোক্ষ সুযোগ সৃষ্টি।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য নিম্নের চিত্র-২৬.১ এ মৎস্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ দেখানো হলো :

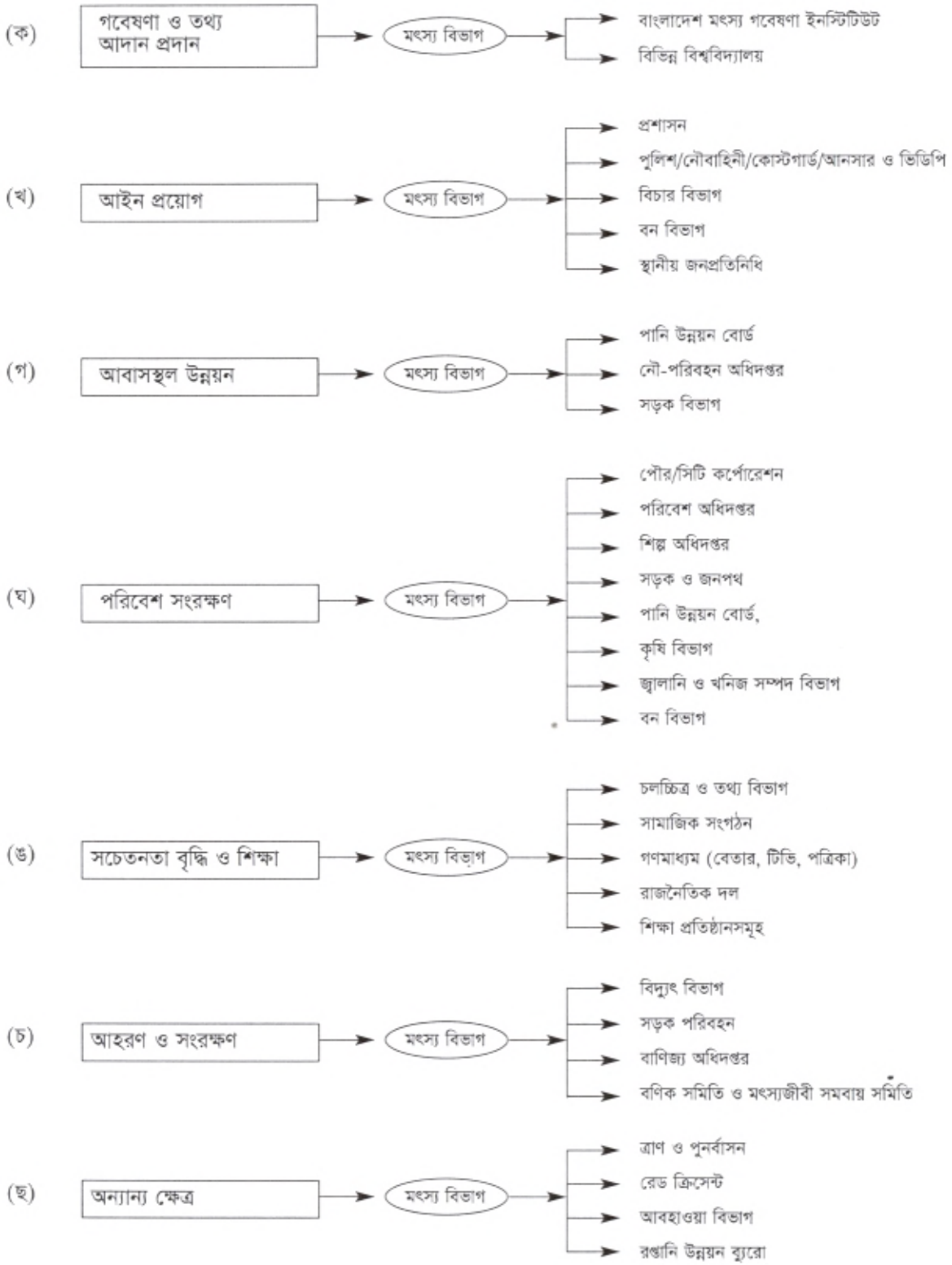

চিত্র - ২৬.১ : আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ক্ষেত্র ও প্রতিষ্ঠান

(ক) আইন প্রয়োগ

মুক্ত জলাশয়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা বিশেষত ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মাছের টেকসই আহরণ মাত্রা বজায় রাখতে হলে প্রাথমিক ও কার্যকরী পদক্ষেপই হলো মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগ। এ লক্ষ্য সাফল্যজনকভাবে অর্জন করতে গেলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থাসমূহের আন্তরিক সহযোগিতার কোন বিকল্প নেই। যেমন– প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের (ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার) আইনী ও প্রশাসনিক সহায়তার পাশাপাশি পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আইন প্রয়োগে একান্ত সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তদুপরি পারিপার্শ্বিক বৈরী পরিস্থিতিতে নৌবাহিনী/ কোস্টগার্ডের (নৌযান ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিসহ) সহায়তা আশাতীত ফল দিতে পারে।

অন্যান্য সহায়ক সংস্থা হিসাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগে সহযোগী সংস্থা হিসাবে বন-বিভাগ ও পরিবেশ বিভাগের কর্মীগণ যথেষ্ট সহায়তা দিতে পারে। তা ছাড়া স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভাসমূহ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইন অমান্যের স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে মৎস্য বিভাগকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারে।

(খ) আবাসস্থল উন্নয়ন

মুক্ত জলাশয়ের ইলিশ সম্পদের ব্যবস্থাপনায় আবাসস্থল উন্নয়ন একটি জরুরী ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করতে হলে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র, চারণ ক্ষেত্র ও চলাচলের গতিপথ অর্থাৎ আবাসস্থল উন্নয়ন বা এ সবের অবক্ষয় রোধে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার সহায়তা নেয়া যেতে পারে। যেমন– পানি উন্নয়ন বোর্ড, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অধিদপ্তর বা সড়ক ও জনপথ বিভাগ এই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ সহায়তা দিতে পারে।

(গ) পরিবেশ সংরক্ষণ

মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ অবক্ষয় একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। পরিবেশ অধিদপ্তর জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ তথা জলজ জীববৈচিত্র্য রক্ষাকল্পে ইতোমধ্যে বিভিন্ন অধ্যাদেশ ও বিধিমালা প্রণয়নের পদক্ষেপ নিচ্ছে। এসব আইন বাস্তবায়ন করা গেলে প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ বিশেষত ইলিশ মাছের মজুদ বাড়াতে ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে।

শিল্প অধিদপ্তরের মাধ্যমে পেপার মিল, রাসায়নিক কারখানার মারাত্মক বর্জ্য যাতে সরাসরি নদীতে ফেলে জলজ পরিবেশের ক্ষতি করতে না পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। তদ্রুপ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোও নাগরিক বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে জলাভূমি/নদীতে ফেলার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে।

কৃষি বিভাগ কৃষি কাজে ব্যবহৃত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যুক্ত কীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির বহুল ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে কীটপতঙ্গ দমনের পদক্ষেপ নিতে পারে। সড়ক ও জনপথ এবং পাউবো ইত্যাদি সংস্থা নদীতে চর পড়ে মৎস্য চারণ ক্ষেত্র নষ্ট করে এ রকম পদক্ষেপ না নিয়ে বিকল্প পদক্ষেপের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সহযোগিতা করতে পারে। বন বিভাগ-বন উজার বন্ধে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিয়ে নদী ভরাট, গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদি রোধে ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বনায়ন করা হলে নদী ভরাট সমস্যা বহুলাংশে সমাধান হবে।

(ঘ) সচেতনতা বৃদ্ধি

প্রাকৃতিক জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ রক্ষায় জনগণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/সংস্থাসমূহের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অভাবনীয় অবদান রেখে সহযোগিতা করতে পারে চলচ্চিত্র ও তথ্য বিভাগ। বেতার, টিভিতে সাক্ষাতকার, কথিকা প্রচার, জারীগানের আয়োজন, পত্রিকায় খবর ছেপে ও ফিচার লিখে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সজাগ করে তুলতে পারে। তথ্য অধদপ্তর এ ব্যাপারে প্রেস রিলিজ, ভিডিও চিত্র সিনেমা স্লাইড দেখিয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে।

তা ছাড়াও সামাজিক, সেবামূলক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহও গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম। স্থানীয় সরকার যেমন– ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভাসমূহ সভা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত গঠন করে মৎস্য আইনের সুফল সম্পর্কে এলাকার জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তুলতে পারে। এতে অন্যান্য মৎস্য প্রজাতিসহ ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

(ঙ) আহরণ, সংরক্ষণ ও অন্যান্য

ইলিশ আহরণের সঠিক পদ্ধতি, সংরক্ষণের সঠিক পন্থা এবং দেশে বিদেশে সুচারুরূপে উচ্চ মূল্যে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ইলিশ ধরা ও ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও সংস্থাকে অন্যান্য সহযোগী সংস্থা যেমন- বণিক সমিতি, বিদ্যুত, বাণিজ্য অধিদপ্তর কাজ করতে পারে। বিশেষত বড় ইলিশ মাছ উচ্চমূল্যে বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হলে জাটকা বা অপেক্ষাকৃত ছোট মাছ ধরার মাত্রা কমে যেতে পারে। এ কাজটিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও অবদান রাখতে পারে।

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে আঞ্চলিক উদ্যোগ ও সহযোগিতা

প্রয়োজনীয়তা

ইলিশ মাছ পশ্চিম ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্বাদুপানির নদ-নদী, মোহনাঞ্চল, ঈষৎ লোনা ও উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্র উপকূলের অদূরবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইরান-ইরাকের পারস্য উপসাগর, ভারতের পশ্চিম উপকূল ও আরব সাগর, বঙ্গোপসাগরীয় এলাকায় সবচেয়ে বেশি ইলিশের অধিবাস এবং বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারেই সবচেয়ে বেশি ইলিশ ধরা হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশে মোট ইলিশের ৫০-৬০%, ভারতে ১০-১৫% মায়ানমারে ২০-২৫% এবং বাকি ১০-১৫% মাত্র অন্যান্য দেশে ধরা হয়। নদীকেন্দ্র চাঁদপুরের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারে ধৃত ইলিশ একই পপুলেশনের এবং একই মজুদ/ভাণ্ডারের অংশ (মিলটন ও চিনারী, ২০০১; হোসেন ও অন্যান্য ১৯৯৮)। অতএব ইলিশ মাছের টেকসই উৎপাদনের স্বার্থে ইলিশ মাছের যৌথ ব্যবস্থাপনা করা দরকার। নচেৎ কোন দেশ এ মাছের সংরক্ষণে কাজ করে যাবে আর অন্য দেশ অতি আহরণে রত হবে তাতে আন্তঃদেশীয় কোন্দল সৃষ্টির আশঙ্কা সৃষ্টি হয় বৈকি। তাই এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।

যে সকল দেশ আঞ্চলিক সহযোগিতায় জড়িত হতে পারে।

বিশ্বের মোট ধৃত ইলিশের সিংহ ভাগ (৯০-৯৫%) যেহেতু বাংলাদেশ, ভারত এবং মায়ানমারে ধরা হয় সেহেতু প্রাথমিকভাবে একটি ত্রিদেশীয় সহযোগিতা সৃষ্টি হওয়াই উত্তম। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের উদ্যোগী এবং অগ্রণী ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে করে অন্য দেশ দু'টিও টেকসই ইলিশ উৎপাদনে (আহরণে) এগিয়ে আসবে।

সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশের মতো ভারতের গঙ্গা নদী অববাহিকার হুগলী-মাতলাহ মোহনা অঞ্চলেও প্রচুর জাটকা ধরা পড়ে। এ ছাড়াও ভারতের গঙ্গা, গোদাবরী, দয়া ইত্যাদি নদীতে ইলিশের বেশকিছু প্রজনন ক্ষেত্র রয়েছে। কিন্তু এসব প্রজনন ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এখনও অস্পষ্ট। পক্ষান্তরে মায়ানমারের ইলিশ সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এদিকে বাংলাদেশ ইলিশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বেশ কিছু আইনগত ও বাস্তব পদক্ষেপ ইতোমধ্যে নিয়েছে ও নিচ্ছে। যেমন- অভায়শ্রম স্থাপন, জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণ, সময় সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি। বঙ্গোপসাগরের ইলিশের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশের অনুরূপ পদক্ষেপ ভারত ও মায়ানমার নিতে পারে। উক্ত তিনটি দেশ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করতে পারে।

১) **তথ্যের আদান-প্রদান**

তথ্যের আদান প্রদান বিশেষত বৈজ্ঞানিক, ব্যবস্থাপনাগত ও পরিবেশগত তথ্যাবলীর আদান-প্রদানের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যেতে পারে।

২) **যৌথ গবেষণা কাজ**

বাংলাদেশ ও ভারতে স্বাদু পানির ইলিশের ওপর কিছু গবেষণা কাজ হলেও ইলিশের সামুদ্রিক জীবন বৃত্তান্তের ওপর খুব কমই কাজ করেছে। ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র, প্রজনন জীববিদ্যা, কৃত্রিম প্রজনন, অভিপ্রয়াণ ও চলাচলের ধারা, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে যৌথ উদ্যোগে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ রয়েছে। এতে এতদ্অঞ্চলের ইলিশের টেকসই আহরণ মাত্রা ও প্রাচুর্য বৃদ্ধিতে সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যেতে পারে।

৩) **দূষণ এবং পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ ব্যবস্থা গ্রহণ**

বাংলাদেশ ও ভারত বর্তমানে মারাত্মক দূষণের কবলে পতিত। ভারত পানি দূষণ রোধে কিছুটা সাফল্য অর্জন করলে (বিশেষত গঙ্গা নদীর) বাংলাদেশে এখনও তেমন অগ্রগতি নেই। যৌথ পদক্ষেপের মাধ্যমে যৌথ ভাবে প্রবাহিত নদীসমূহের দূষণ রোধে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দূষণ সমস্যা সমাধানে অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব।

৪) **আঞ্চলিক ইলিশ ব্যবস্থাপনা কর্মকৌশল নির্ধারণ**

ইলিশ বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের অভিন্ন সম্পদ হওয়ায় ইলিশ ব্যবস্থাপনার একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরিই সহযোগিতার মূল কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত।

৫) **ডাটাবেজ তৈরি**

এই তিনটি দেশের ইলিশ সম্পদ আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যাদি সম্বলিত যৌথ কম্পিউটার ডাটাবেজ তৈরি করা ইন্টারনেট যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

কিভাবে শুরু করতে হবে?

- আঞ্চলিত সম্মেলন/কর্মশালার আয়োজন
  ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারত, মায়ানমার ও বাংলাদেশের ইলিশ বিজ্ঞানী, মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও নীতি-নির্ধারকদের সমন্বয়ে ত্রিদেশীয় সম্মেলন/কর্মশালা আয়োজনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

এবং

- কর্মশালার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহের চিহ্নিত করতে হবে;
- ঐ সকল ক্ষেত্রে কি কি ভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা নির্ধারণ করা এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া;
- এ ব্যাপারে দেশসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক চুক্তিতে উপনীত হওয়া ;
- চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করে তাদের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নীতিনির্ধারণ, প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের নীতিনির্ধারকগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটি প্রটোকল তৈরি ছাড়াও উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থের উৎস খুঁজে বের করবেন। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা যেমন: BOBP, ADB, FAO, GEF, IDA ইত্যাদি সংস্থার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থের যোগান পাওয়ার জন্য সংযোগ রক্ষা করবেন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ২৮ | দিন : ০৫ | মেয়াদকাল : ৬০ মিনিট

শিরোনাম : ইলিশ মাছের ওপর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মডিউল তৈরি

লক্ষ্য : ট্রেইনার ট্রেনিং এর পরবর্তী সময়ে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন। চলতি কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীগণ উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করবেন। এ জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য একটি মডিউল তৈরির জ্ঞান লাভ করবেন।

উদ্দেশ্য : এক দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয় ও শিরোনাম নির্বাচন।

বিষয়সূচী	*আলোচ্য বিষয়*	*পদ্ধতি*	*সময়*
ভূমিকা	স্বাগতম অধিবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।	বক্তৃতা	৫ মিনিট
বিষয়বস্তু	**১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়বস্তু নির্বাচন** কোর্স চলাকালীন সময়ে প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রদত্ত মান বোর্ডে উপস্থাপন করবেন এবং প্রাপ্তমান অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে বিন্যাস করবেন। অতঃপর ১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উপযোগিতা অনুযায়ী সর্বোচ্চমান প্রাপ্ত ৬-৮টি বিষয় নির্বাচন করবেন। **১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের শিরোনাম নির্দ্ধারণ** কোর্স সমন্বয়ক কয়েকটি শিরোনাম প্রস্তাব করবেন এবং যে শিরোনামের পক্ষে সর্বোচ্চ মতামত পাওয়া যাবে সেটা চূড়ান্ত করবেন। **১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের অনুপাত নির্দ্ধারণ** কোর্স সমন্বয়ক জেলাওয়ারী মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা জানাবেন, অতঃপর আলোচনার মাধ্যমে সকল স্টক হোল্ডারের একত্রে অথবা পৃথক প্রশিক্ষণ হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে একীভূত অথবা পৃথক হলে একীভূত অথবা পৃথক ভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের অনুপাত নির্দ্ধারণ করবেন।	আলোচনা প্রশ্ন-বিরতি-নাম ও ফ্লিপচার্ট	৩০ মিনিট ১০ মিনিট ১০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা, উদ্দেশ্য যাচাই ও পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান।	প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৫ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, ডাস্টার।			

ষষ্ঠ দিন - অধিবেশন পরিকল্পনা ও হ্যান্ডআউট

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ২৯ | দিন : ০৬ | মেয়াদকাল : ৬০ মিনিট

শিরোনাম : **প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন**

লক্ষ্য : এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের লক্ষ্য হচ্ছে ৬ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ শেষে অগ্রগতির মান যাচাই এবং সফলতম প্রশিক্ষণার্থী শনাক্তকরণ করা হবে যাতে তারা তাদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী অগ্রগতি বুঝতে পারেন।

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ—

- প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রগতির মান যাচাই করতে পারবেন;
- সফলতম প্রশিক্ষণার্থী শনাক্তকরণ করতে পারবেন।

বিষয়সূচী	*আলোচ্য বিষয়*	*পদ্ধতি*	*সময়*
ভূমিকা	স্বাগতম বর্তমান অধিবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক কর্তৃক প্রশ্নপত্র বিতরণ ও পরীক্ষা গ্রহণ।	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু	- প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক উত্তরপত্র পূরণ; - নির্ধারিত সময়ের ৫ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার্থীগণকে শেষ সময় সম্পর্কে অবহিতকরণ; - নির্ধারিত সময় শেষে উত্তরপত্র সংগ্রহ।		৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ			৬ মিনিট
	- মূল্যালয়নপত্র সংগ্রহ; - ধন্যবাদ জ্ঞাপন; - কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোকপাত।		
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়নপত্র (প্রশ্নপত্র) ২৫ সেট।			

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ৩০ | দিন : ০৬ | মেয়াদকাল : ৬০ মিনিট

শিরোনাম : প্রশিক্ষণ কোর্স ও উপস্থাপক/প্রশিক্ষকদের মূল্যায়ন

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা কোর্স ও প্রশিক্ষকদের মূল্যায়ন করানো যাতে সম্পাদিত কোর্সের বিষয়বস্তুর উপযোগিতা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক কার্যাদি এবং প্রশিক্ষকদের উপস্থাপনার বিষয়ে কোর্স সমন্বয়ক প্রতিভাব পেতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীরা কোর্স মূল্যায়নপত্র (ফরম ক ও খ) ব্যবহার করে সম্পাদিত কোর্স এবং প্রশিক্ষক সম্পর্কে সামগ্রিক মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

বিষয়সূচী	*আলোচ্য বিষয়*	*পদ্ধতি*	*সময়*
ভূমিকা	স্বাগতম কোর্স মূল্যায়নের উদ্দেশ্য; মূল্যায়নপত্র পূরণ করার পদ্ধতি।	বক্তৃতা	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু	- প্রশিক্ষণার্থীদের বসার আয়োজন - মূল্যায়নপত্র বিতরণ; - প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক মূল্যায়নপত্র পূরণ (ফরম ক ও খ)।		৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	- মূল্যায়নপত্র সংগ্রহ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন; - পরবর্তী অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের বিষয়ে আলোকপাত।	প্রশ্ন-বিরতি-নাম	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : কোর্স ও প্রশিক্ষক মূল্যায়নপত্র (ফরম ক ও খ মোট ২৫ সেট)			

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং : ৩১ | দিন : ০৬ | মেয়াদকাল : ৯০ মিনিট

শিরোনাম : সাধারণ আলোচনা, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও সমাপনী অনুষ্ঠান।

লক্ষ্য : এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে সাধারণ আলোচনা, পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও সমাপনী অনুষ্ঠান করা হবে যাতে তারা বিগত ৬ দিনের প্রশিক্ষণের সুন্দর সমাপ্তি টানতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ—

- সাধারণ আলোচনার অংশগ্রহণ করতে পারবেন;
- পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারবেন;
- সমাপনী অনুষ্ঠান পরিচালনার সফল হবেন।

বিষয়সূচী	*আলোচ্য বিষয়*	*পদ্ধতি*	*সময়*
ভূমিকা	- স্বাগতম - পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন - বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোচনা	বক্তৃতা	৫ মিনিট
বিষয়বস্তু	- সাধারণ আলোচনা - ফলাফল প্রকাশ - সমাপনী অনুষ্ঠান	বক্তৃতা ফলাফল শীট	৭৫ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	- মূল বিষয়ের পুনরালোচনা - উদ্দেশ্য যাচাই - ধন্যবাদ জ্ঞাপন।		১০ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ফলাফল শীট, মার্কার, হোয়াইট বোর্ড।			

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কোর্স মূল্যায়নপত্র

আপনার মতামত অনুযায়ী সঠিক ঘরে ঠিক (✔) চিহ্ন দিন

১. সামগ্রিকভাবে মেয়াদকাল উপযোগী ছিল?	হ্যাঁ	☐	না	☐	মোটামুটি	☐
২. কোর্সের মেয়াদকাল কেমন ছিল ?	খুব দীর্ঘ	☐	সঠিক	☐	খুব অল্প	☐
৩. কোর্স উপস্থাপনার গতি কেমন ছিল ?	খুব দ্রুত	☐	সঠিক	☐	খুব বেশি তাত্ত্বিক	☐
৪. কোর্সে সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ সামগ্রীর মান কেমন?	খুব ভাল	☐	ভাল	☐	ভাল নয়	☐
৫. সরবরাহকৃত হ্যান্ডআউটের মান কেমন ?	খুব সহজ	☐	সহজ	☐	জটিল	☐
৬. শিক্ষণ পরিবেশ কেমন ছিল ?	ভাল	☐	উত্তম	☐	ভাল নয়	☐
৭. প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ কৌশল উপযোগী ছিল কিনা?	হ্যাঁ	☐	না	☐	মোটামুটি	☐

৮. নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তু কোর্সে সংযোজন করা আবশ্যক

১। .....

২। .....

৩। .....

৪। .....

৫। .....

১০. নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তু কোর্স হতে বাদ দেয়া আবশ্যক

১। .....

২। .....

৩। .....

৪। .....

৫। .....